প্রতীতি

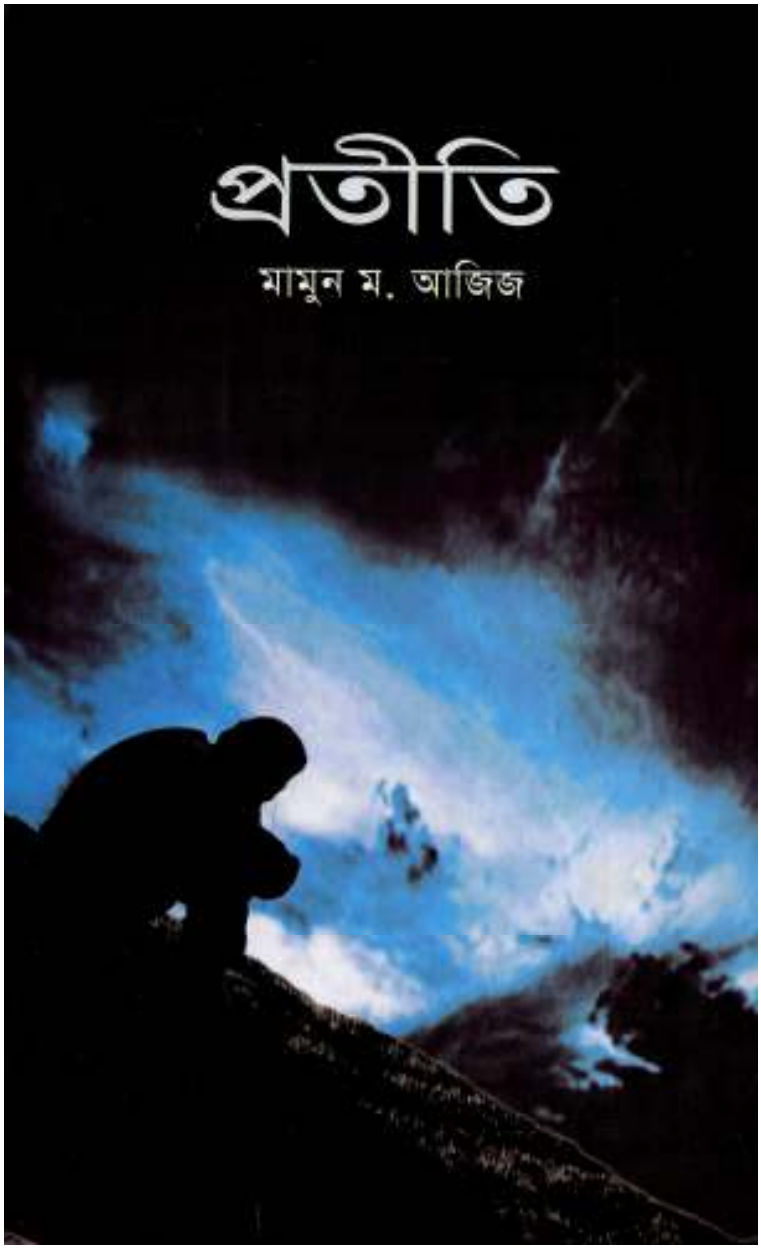

প্রতীতি

মামুন ম. আজিজ

শব্দশৈলী

প্রতীতি
মামুন ম. আজিজ

© লেখক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১০
শব্দশৈলী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-এর পক্ষে ইফতেখার আমিন কর্তৃক প্রকাশিত
এবং সোবাহান প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস- সাব্বির কম্পিউটার।

প্রচ্ছদ : আইরিন সুলতানা

মূল্য : একশত টাকা মাত্র।

ISBN : 984-70189-0028-8

PROTITY (A novel) by Mamun M. Aziz, Published By Iftekhar Amin.
Shobdoshoily, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail : shobdoshoily@yahoo.com.
Publish February 2010. Price : 100.00 Taka.

বাংলাদেশ পরিবেশক : মনন প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

উৎসর্গ

বই পড়ার ইচ্ছেটা অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন যিনি,
আমার বাবা
মরহুম শেখ আব্দুল আজিজ কে।

প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রতীতি প্রাণে, মনে, মননে কিংবা বিবেকের ভেতর ধারন, সংযোজন, পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন করার নাম বলা যেতে পারে জীবন। ঠিক এই মুহূর্তে জীবন সম্পর্কে আমার প্রতীতি অর্থাৎ উপলব্ধি ঠিক ঐ রকম। সবুজ কচু পাতার উপর এক ফোঁটা পানির অবস্থানকে আর্টে কিংবা ফটোগ্রাফিতে ধারন করে খুব সহজ ভাবে জীবনকে উপমিত করা হয়। আবার জীবন মানে কোথাও কোন বিমূর্ত দৃষ্টির খোলা আকাশে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা। প্রচন্ড ভার্সেটাইল সেই জীবনের নানার রূপ একজন অতি সাধারণ মানুষের চোখে দেখে, নিজের মত করে বুঝে যা পেয়েছি তারও অতি সামান্য খন্ড চিত্র কিছু এইখানে আমার এই উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরে অনভিজ্ঞ কিংবা কাঁচা লেখনীতে তুলে ধরার প্রয়াস খুঁজেছি। উপন্যাসের কাহিনী বা চরিত্রগুলো হয়তো কখনও অজ্ঞাতে বাস্তবতার সাথে মিলে যাবে আবার হয়তো কখনও মিলবেনা মোটেও। তবুও মনের গভীরে জীবনের যে অগণিত প্রতীতি ধারন করেছি তার নির্যাস ঢেলেছি উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনার মাঝে। হতে পারে কখনও কোন ঘটনা স্পষ্ট আবার কখনও কোন ঘটনা ঠিক বিপরীত-অস্পষ্ট। মানব মনটাও তো ঠিক তেমনই। সর্বদা স্পষ্ট আর অস্পষ্ট ধারনার যৌথ আলিঙ্গনে মেশানো প্রতীতি নিয়েই তার সামনে এগিয়ে চলার কাব্য।

জীবনের নিত্যসময়ে নিত্যই আমরা অজস্র অজস্র সমস্যার সম্মুখীন হই যা থেকে প্রতিটি মানব মনেই জন্ম নেয় কোন না কোন প্রতীতি। তা সে মানুষ চিন্তক হোক কিংবা চিন্তাহীন। হুটহাট করে লিখে ফেলা এই প্রথম উপন্যাসে হয়তো আমার প্রতীত মন হতে ঝরে পড়েছে আমাদের চারপাশের অনেক অনেক সমস্যার কথা। হয়তো সমাধান স্পষ্ট হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হয়তো হবে কোন পাঠকের কাছে, হয়তো হবেই না। তবুও একটু প্রতীতি, একটু ভাবনা পাঠকের মাথায় ছড়িয়ে দিতে পারলেই ভাবব আমি স্বার্থক।

মামুন ম. আজিজ
দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা।
০১/০১/২০১০

mamunmaziz@gmail.com

সমস্যা মনের গভীরেই সব। ওটাই ঠিক। যে মন দিয়ে সমস্যা বোঝার চেষ্টা করি তারই তো রোগ হয়েছে, 'সমস্যা রোগ'। সমাধান খুঁজি আবার সেই আক্রান্ত মনটা দিয়েই। সমাধান কোথা থেকে হবে? নো হয়ার টু গো ফর সমাধান, সমাধান ইজ আউট অব দিস...

আইইএলটিএস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সায়ান, স্পিকীং সেকশনে 'অ্যাবাউট ইউর সেলফ' টাইপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে তাই ভাবার চেষ্টা করছে বাসে বসে । অথচ মাথায় কঠিন কঠিন ফিলোসফি এলোপাথাড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসছে। ফাঁকে ফাঁকে আবার চোখ দুটো রাস্তায় যা দেখছে তাকেই ইংরেজীতে কনভার্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু মনটা বারবার বিভ্রান্ত হচ্ছে ফিলোসফির সাথে সূতো কাটা কাটি খেলায়। যদিও তার নিজস্ব ফিলোসফি খুবই সরল ফিলোসফি। জটিলতা এখন পরীক্ষার টেনশনে অকারণ মাথায় ভর করেছে। সে টেনশন ডব্লিই ডব্লিউ এফ এর নানান মেকী প্যাচে কাবু করে ফেলছে মনটাকে।

চারদিকে কেবলই সমস্যা। সমস্যার কোন অন্ত নেই। এত এত সমস্যা এ দেশে, তাইতো সে পাড়ি জমাবে বহুদূর, এসব ছাড়িয়ে অন্য কোথাও, অন্য দেশে।

বাসটা থেমে আছে রাস্তার পাশে। আসলে থামিয়ে রাখা হয়েছে। সার্জেন্ট লাইসেন্স নিয়ে গেছেন, পিছে পিছে গেছে কন্ডাকটর। ড্রাইভার মোলায়েম স্বরের রাগে গজগজ করছে, কয়েকটা অশালিন শব্দও সার্জেন্টের উদ্দেশ্যে সে কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, যদিও সে স্বর সার্জেন্টের কানে পৌঁছানোর মত নয়। ভীষণ এক ভয়ও সে উচ্চারনে স্পষ্ট।

সমাধান একটা হয়ে যাবে। এসব নিত্য ঘটনা। হয়তো নেগোসিয়েশনে মিলছে না। যাক, সময় তো আছে অনেক। পথের মাঝে কিছু ইংরেজী খোঁজাই ভালো মনে হলো এই মুহূর্তে সায়ানের।

বাসের পাশ ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে উল্টোদিক হতে হেঁটে আসছে আকর্ষনীয় চেহারার এক তরুণী। রোদের বেয়াড়া আদরের হাত থেকে রক্ষা পেতে ওড়নাখানা মাথাটা হালকা ছুঁয়ে সুশ্রী মুখটাতে কৃত্রিম ছায়ার সৃষ্টি করছে। অসম্ভব সুন্দর তরুণীটির দিকে মাথা ঘুরিয়ে দুবার তাকাতে বাধ্য হলো। ও

মেয়েটা সে লুক অবশ্যই ডিজার্ভ করে। সায়ান ভাবল, মেয়েটা হাসল কেনো, তাও আবার তারই দিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ, তারই দিকেই, পেছনে আর কেউ নেই, সবার পেছনের সিটে জানালার ধারে সেইতো বসে আছে। এ হাসির নাম কি হবে, স্মাইল, লাফ? লাফ তো নয়ই। নাকি গিগল, চাকল কিংবা স্নিগার? দূর বাংলাই ভালো, এক 'হাসি'-তেই সব শেষ।

দফারফা শেষ হয়েছে। লোকজন বেশ বিরক্তি নিয়ে কিছু কটুক্তি ছুড়ে দিল। কেউ ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে, কেউ বা সার্জেন্টের। এখানেও ডিভাইডেশন। মনেরই যত সমস্যা। কোন দিকে যাওয়া উচিৎ সেটাও আসলে মন বোঝে না। একটা বড় ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা চলতে শুরু করল। এই ঝাঁকুনিটা স্বাভাবিক না। এটাই বাসের সমস্যা , এটাই বাসের অপরাধ। সমস্যা থাকলে উৎকোচ-ই সমাধান। সমাধান তো ফাইন্ড আউট করেছে সেই সমস্যাযুক্ত মনটাই...নিজের উপর বিরক্ত হলো সায়ান। এত ফিলোসফি আজ আসছে কোত্থেকে? আবার মনে মনে আওড়াতে লাগল...আই'ম সালেহ মাহমুদ সায়ান...

সায়ানের পাশে বসা লোকটা হঠাৎ সায়ানের সে মনোযোগে মনোভঙ্গ ঘটিয়ে জিজ্ঞেস করল, এক্সকিউজ মি, আপনার সাথে কি মোবাইল আছে?

প্রথমবার সেটা খেয়াল না করায় পাশে বসা লোকটা দ্বিতীয়বারের মত একই কথা জিজ্ঞেস করল।

সামনের সিটের কোনায় বসা একজন লোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, তার ছোটখাট কালো চেহারায় বড় বড় দুটি বেমানান চোখ, সে চোখ দুটিতে সন্দেহমাখা দৃষ্টি। ভ্রুটা হালকা কুঁচকানো।

পাশের লোকটার বলার ভঙ্গিতে একটা বিসদৃশ্য ব্যাপার আছে। সম্ভবত সামনে থেকে বেমানান দৃষ্টির দৃষ্টিপাতের সেটাই কারন। পাশের লোকটা কথাটি বলার সময় দুবারই সায়ানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং কথা বলেছে খুব নিচু স্বরে। চেহারা মোটামুটি সুদর্শন লোকটার। গায়ের রংও উজ্জ্বল। ঠোঁটের উপর মাঝারি আকারের একটা মোচ। মোচের বাম পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ওটা মোচের বাম আর্ধেককে দুভাগে ভাগ করেছে, ব্যাপারটা দৃষ্টিতে পড়ার মত। সায়ান মনে মনে ভাবল, এমন খন্ডিত যখন, তখন মোচ রাখারই বা কি দরকার ছিল!

মাঝ বয়সের অচেনা ঐ লোকটার কথায় সায়ানের মনে যে দ্বিধা রচনা হতে যাচ্ছিল সামনের বেমানান চোখের দৃষ্টিপাত সে দ্বিধার কবর গড়ে দিল। সংগত কারনেই খুব স্পষ্ট ভাবে সায়ান জিজ্ঞেস করতে যাবে-কেনো?- তার আগেই লোকটি নিজে থেকেই আবার বলে উঠল, ভাই মোবাইলটা বোধহয় রুমে ফেলে এসেছি, আপনার মোবাইল থেকে একটু ফোন করে খোঁজ নেয়া যাবে?

সায়ানের ডান হাতটা বাসের জানালার ধারে ফেলে রাখা। জানালাটা খোলা আর না খোলা সমান। সেখানে কোন কাচ নেই। পুরো ডান হাতটাতে রোদ এসে জড়িয়ে ধরেছে। রোদ জড়ানো হাতটার দিকে তাকিয়ে সায়ানের সরল ফিলোসফিক মন ভাবতে থাকে ধান্দাবাজীর রকমফের-এই শহরে কত রকম যে ধান্দাবাজ-চিটার-বাটপার এলাপাথাড়ি যত্রতত্র নিজ নিজ কর্ম করে বেড়াচ্ছে, রোজ খবরের কাগজে দেখা যায় ধান্দাবাজীর নতুন নতুন তথ্য। এখানে মানুষ হয়েও মানুষকে বিশ্বাস করাই সবচেয়ে কঠিন। মানুষের চেয়ে পশু পাখীই অনেক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কারন তাদের কর্মকান্ড অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট নয়-নির্দিষ্ট। তবুও ভাবতে ভাবতেই লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ মায়ার হ্রদে মনটা ডুবে গেলো। খুব সাধারণ ধরনের উজ্জ্বল চেহারাটার দিকে তাকিয়ে না বলতে পারলো না । রোদ জড়ানো হাতটা রোদের আলিঙ্গন হতে সরিয়ে নিল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইলটা বের করে বলেই ফেলল, নম্বরটা বলেন।

প্রথমবার কল গেলো না। আবার একবার কল দিল সায়ান।

বলল, মোবাইলটা তো ভাই বন্ধ ।

ও আচ্ছা, তাই ।

কথা টুকু বলেই লোকটা নিচের দিকে তাকাল। খুব চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। হাতদিয়ে মাথাটা চুলকাল একবার। লোকটার জন্য সায়ানের মায়ার পরিমাণ আরেকটু বেড়ে গেলো। সামনের সিটের লোকটা এর মধ্যে আরও একবার পেছনের সিটের মানুষ দুজনার দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। সায়ান পাশের লোকটা কিছু একটা বলবে ভেবেও কি বলা উচিৎ বুঝতে পারল না। হাতটাকে তাই আবার এগিয়ে দিল রোদের সান্নিধ্যে। রোদ জড়িয়ে নিল মুহূর্তে হাতটা।

বাসটা থামল শাহাবাগের মোড়ের কাউন্টারে। সায়ান মোবাইলের ঘড়িতে চোখ বুললো। দশটা বাজে। আরও এক ঘন্টা সময় আছে হাতে। ধানমন্ডি ব্যাট সেন্টারে তার সিট পড়েছে। এই স্টপেজে সামনের কয়েকটা সিটের মোট নয়জন যাত্রী নেমে পড়ল। একজন করে নামছিল আর কোন অজানা কারনে সায়ান কাউন্ট করছিল। বাসের পেছনে এখন সায়ান আর মোবাইল হারানোর চিন্তায় উদ্বিগ্ন লোকটি আর সামনের সিটের বেমানান চোখের মানুষটি ছাড়া পেছনের তিন সারিতে আর কোন লোক নেই। সায়ানের একবার মনে হলো সামনে এগিয়ে গিয়ে বসলে কেমন হয়। পরক্ষণেই মনে হলো আর অল্প পথ, থাক না, দু'বার উঠে কি লাভ।

বাস আবার চলতে শুরু করেছে। লোকটার দিকে তাকাতেই মায়াটাও বাড়তে থাকল। সায়ান এবার জিজ্ঞেস করেই বসল, ভাই কোথাও পড়ে যায় নি তো? মনে করে দেখুন তো।

না মেসের রুমেই রেখে এসেছি, কথাটুকু বলেই পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করে বলল, ভাই এই নম্বরে আরেকটু কল দিয়ে দেন না, আমার রুমমেট..."

নিঃসংকোচে সে নম্বরটাতেও ডায়াল দিল সায়ান। ওপাশ থেকে হ্যালো ভেসে আসতেই সায়ান মোবাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ভাই নেন, কথা বলেন।

সামনের সিটের লোকটা আর তাকাচ্ছে না, বোধহয় তার মনেও সায়ানের মত ধান্দাবাজীর কোন আশংকা কাজ করছিল,এতক্ষণে সেই শংকা দূর হয়ে গেছে।

রহমত, আমার মোবাইলটা খাটের পাশে রেখে আইছি, পাইছস.....হ, ঠিক আছে, বন্ধ করে তোর লগে রাখ... ভাল জিনিস, হবে...বিকালে.."

লোকট কথা গুলো শেষ করে মোবাইলটা এগিয়ে দিতে দিতে খুব বিনয়ের সাথে ধন্যবাদ শব্দটা উচ্চারণ করল আর সেই সাথে মোবাইল সায়ানের হাত স্পর্শ করারা আগে লোকটার হাত স্পর্শ করল তার হাত।

সামান্য সুই এর খোঁচা ঠিক আঁচ করতে হয়তো পারল না সায়ান কারন মুখে তখন তার স্বভাব সুলভ বিনয়মাখানো হাসি আর কণ্ঠে উচ্চারণ-ঠিক আছে , ঠিক আছে।

লোকটার চেহারা মনে আছে তো?

হ্যাঁ, ছোট মামা ..দেখলেই চিনতে পারব, অদ্ভুদ ভাঙা মোচটা কি ভোলা যায়? মোচের বাম পাশটা অসমভাবে বিভক্ত। নজর কারার মত। কিন্তু সত্যি তুমি খুঁজে বের করতে পারবা? কিভাবে?

উপায় অনেক আছে, একটা না একটা কাজে লাগবেই। শোন, বাংলাদেশের পুলিশদের দক্ষতার কমতি নেই, তারা সবই পারে, কেবল সিস্টেম দক্ষতা প্রদর্শনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ও কথা বাদ দে, তোর শরীর এখন কেমন লাগছে সেটা বল?

ভাল, মা তো বলল আজ বিকেলেয় বাসায় যেতে পারব।

শরীরে কোন রকম যন্ত্রনা, ব্যাথা নাই তো? কোন অসস্তি বা ভয় টয়? বুঝলি - ভয় পাবার কিছুই নেই। এরকম ঘটনা ঢাকা শহরে প্রতিদিন কম করে

হলেও ৪০/৫০ টা ঘটে । সো তুই একাই এমন ঘটনার শিকার না। মানসিক কোন দুশ্চিন্তা করবি না। বেশী রাগ লাগলে, ঐ ব্যাটাকে যখন ধরে আনব তুই থানায় গিয়ে ঠাস্ করে গালে একটা চড় দিয়ে আসবি। দেখবি রাগ একদম কমে যাবে। রাগ কমানোর সবচেয়ে সাদাসিধে সহজ উপায় রাগকে ট্রান্সফার করে দেয়া।

নাহ! মামা, বন্দী অবস্থায় তারে মারলে কাপুরুষের মত কাজ হয়ে যাবে। কাপুরুষের মত কাউকে রাগ ট্রান্সফরমার করা ঠিক হবে না। রাগ ট্রান্সফার করতে হবে বীরপুরুষের মত ।

তাইলে একটা কষে গালি দিয়ে আসিছ। মাঝে মাঝে গালিও মনে শান্তি আনে। জানিস তো?

না জানার কি আছে। ঐ ছানা মিয়ার চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই একদিনে ১০০টা গালি শিখে ফেলা যায়। বাংগালীর গালি জানাটা আবশ্যকতার মধ্যে পড়ে।

হুম, ঠিকই। মাঝে মাঝে মনে হয় মামা, গালি বোধহয় যে কোন ভাষার অন্যতম লুকানো বৈশিষ্ট্য। গালির আরেকটা বড় সুবিধা হলো এটা শিখতে কোন টাকা লাগে না। পথঘাট থেকে শুনেই শেখা হয়ে যায়।

মামা ভাগ্নে খুব মজা করা হচ্ছে বুঝি, তা শাহেদ কখন এলে?

এই তো দুলাভাই আধ ঘন্টা হলো । আপা কই?

ডাক্তারের সাথে কিছু বাড়তি কথা বলায় ব্যস্ত সে। বেশী বেশী কথা। যাক তবুও বলে মন শান্ত হোক। আমাকে ডাক্তার আস্বস্ত করতে পেরেছ। আর কোন সমস্যা নেই, কোন ভয় নেই। পয়জন যেটা আইডেনটিফাই করা হয়েছিল পুরোটাই গায়েব। বুঝলে শ্যালক, শরীরে আর একটুও পাওয়া যাচ্ছে না। অবাকই হয়েছেন ডাক্তার। মাত্র দুদিনেই পেশাবের সাথে পুরো পয়জান দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। খুবই গবেষণা করে বানানো হয়েছে ঐ পয়জান। ক্রিয়েটিভ ক্রিমিনাল এর উদ্ভব হচ্ছে মনে হয় দেশে।

দুলাভাই ঠিকই বলেছেন। একটা জিনিস খেয়াল করেছেন বোধহয়, বছর দশেক আগেও ঢাকা শহরের অলি গলিতে মহল্লায় প্রায়ই ঠুনকো আধিপত্য নিয়ে ঝগড়া, মারামারি বা খুন হতো। এখন কিন্তু হয় না। তাই বলে খুন অপরাধ সবই বেড়েছে, কমেনি কিন্তু। দেশের উন্নয়ন কাজে সিস্টেম ডেভেলোপ না করলেও আন্ডার ওয়ার্ল্ডে সিস্টেম ঠিকই ডেভেলোপ করেছে। সেখানে রীতিমত রিসার্চ আর প্রযুক্তি উন্নয়ন চলছে ।

তাইলে তো ধীরে ধীরে সভ্যতাকে গ্রাস করে নেবে অসভ্যতা। অসভ্যতার কাছে প্রযুক্তি আর জ্ঞান বেশী হয়ে গেলে তো হবে না। খেলার মধ্যে ভজঘট পাকিয়ে যাবে।

কিছু করার নেই। সভ্যতার চরম আগ্রাসনের এটাই সমস্যা। সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গেলে আচরণ বদলে যায়।

ঠিক মামা, যেমন চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে পানির তাপমাত্রা কমে গেলে তার রূপই বদলে যায়, বরফ জমতে থাকে-তাই না?

ঠিক মামু, ঠিক। মাথা দেখি মামার একদম পাক্কা ঠিক আছে। তোর উপর তাইলে ভরসা করা যায়। লোকটা কে আইডেনটিফাই করতে কোন ভুল করিস না কিন্তু। তোর চেনার উপর আমার অনেক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে।

আবার সেই প্রিয় গিরিপথ, পাহাড়ী ঝিরির ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলা। অবারিত সৌন্দর্য, সবুজ পাহাড়ে রোদের ঝিলিক। এসব নেশার তারকাটা হয়ে প্রাণে গেঁথে গেছে আজকাল রেশাদের। রুমার বম পাড়ার স্কুলে বড় কোন ছুটি হলেই সে তাই বেরিয়ে পরে বিশাল বান্দরবানের আনাচে কানাচে। মনে তার সৌন্দর্য মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার অপার নেশা। এ নেশা এক দুর্ণিবার নেশা। একবার পেয়ে বসলে জাগতিক সব বৈপরীত্য ভুলে থাকা খুবই সহজ হয়। সঙ্গীর অভাব হয়না রেশাদের। রুমা বাজারের সকলেই তাকে খুব পছন্দ করে। বাংগালী বা পাহাড়ি সকলেই। সে যাত্রা করবে শুনলেই বিশাল দল জুটে যায়। সঙ্গী অবশ্য বেশী সে নিতে চায় না।

আজ আবার বগার লেকে যাচ্ছে রেশাদ। এবার দিয়ে ঐ পথে তার তৃতীয় বার যাত্রা। প্রিয় বন্ধু জুয়েল বম এর ছোট বোন বেবি, জুয়েলের ছোট ভাই রয়েল বম আর রয়েলের এক বন্ধু। বন্ধুটিও বম গোত্রের। মোট চারজনের দল এবার।

পাহাড়ের মাঝে হালকা সমতলের রুমা বাজার এলাকা থেকে বেরিয়ে ঝিরি পথে তারা হেঁটেছে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের কম না। একটু উঁচুতে একটা সমতলে উঠে এল দলটা। এই উর্ধ্ব পথটুকু পেরোলেই পথ আবার কিছুটা নিচে নেমে এল। এর পরের দৃশ্য চরম অসাধারন। বেবি আর অন্যরা অবশ্য সে সৌন্দর্য যতটা মুগ্ধতায় হৃদয়ে স্থান দেয় তার চেয়ে বেশী মুগ্ধ হয় তাদের প্রিয় এই মানুষটির অকৃত্রিম হাসি আর মুগ্ধ চোখের উচ্ছ্বাসে। চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড় আর মাঝে যে অনাবিল সৌন্দর্য প্রকৃতি ধারন করে আছে সে কেবলই দেখার জন্যে। ও কোন কবি সাহিত্যিক কোন দিনই স্পষ্ট প্রকাশ করতেই পারবেনা। সেখানে মাঝে মাঝে রাস্তার কোল ঘেঁষে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে

পাহাড়। পাথরের ভাঁজ। এরই মাঝে প্রায় স্থানেই সোনালী আর সবুজের এক অভাবনীয় মুগ্ধ সমাবেশ। দেখার মতো। আসলে বাঁশ গাছের পাতা শুকিয়ে ঝকঝকে সোনালী রং ধারণ করেছে। আর মাঝে মাঝে আবার কচি সবুজ গাছও এরই সাথে একত্রে জেগে আছে। অসাধারণ এক অভিব্যক্তি জেগে ওঠে চোখে সে সোনাসবুজ দৃশ্যে।

এইরকম নিবিড় নিরিবিলি আর সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দূরে স্পষ্ট হলো একটা উঁচু সবুজ পাহাড়; সেটা দেখে সবার সাথে রেশাদও চিনল-ওটার আড়ালেই তার প্রিয় বগা লেক লুকিয়ে আছে আপন রূপ খুলে। দু'বছর আগে প্রথম বারের মত যখন এসেছিল তখন তো সে পাগল প্রায় হবার মত অবস্থা। সেবার কেওক্রাডং পর্যন্ত গিয়েছিল। চার হাজার ফিটের চেয়ে বেশী উঁচু কেওক্রাডং চূড়ায় উঠেছিল ছয় জনের দলটা। যে দলে একমাত্র সমতলের বাসিন্দা রেশাদ আর বাকী ক'জন ছিল পাহাড়ের মানুষ। ফেরার পথে বগার পাশে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরী বাঁশ আর বেতের যে গেস্ট হাউসগুলো আছে সেখানে থেকেছিল এক রাত।

সন্ধ্যায় ঐ কুঁড়ে ঘরের ওখানে গল্প হচ্ছিল একজন স্থানীয় বৃদ্ধার সাথে, সেও বম গোত্রের, বাংলা খুব একটা ভালো বলতে পারে না। সে সন্ধ্যায় সে বৃদ্ধ বগার ধারে বসে এই লেকের ইতিহাস শুনিয়েছিল। সবই প্রায় উপকথা। সে বলছিল তাদের স্থানীয় ভাষায় আর বেবি সেটা বাংলা করে বলে দিচ্ছিল রেশাদের জন্য। সে তো এক বছর আগের ঘটনা। এখন অবশ্য রেশাদ ওদের ভাষা অনেকটাই বোঝে।

বৃদ্ধ লোকটি বলছিলেন, একটা বিশাল বড় পাহাড় নিচে ডেবে গেছে আর তাই লেকের নিচে ওত বড় বড় পাথরের স্তর। সাথের আরেকজন আধ বয়সি লোক দিলেন আরোও মজার তথ্য। কবে নাকি একজন সুইডিশ বিজ্ঞানী এসে বলে গেছেন, আটলান্টিক মহাসাগেরর সাথে এর তলার সংযোগ আছে। রেশাদ আর বেবি হাসছিল মিটিমিটি। তাদের ভাষ্য মতে লেকের পানি নাকি রঙ বদলায় মাঝে মাঝে, আটলান্টিক এর পানিও নাকি তাই। কখনও নাকি লালচেও হয়। কিন্তু রেশাদ মনে মনে ভাবে সব পর্যটকদের সেটা দেখার দুর্ভাগ্য হয়না। তার মানে কি ...গুজব।

তবে সবচেয়ে মজার রূপকথাটা যখন বৃদ্ধ শুরু করলেন, শুনতে বেশ লাগছিল। বেবির দোভাষীর ভূমিকাতে বলার মধ্যে আলাদা একটা জাদু আছে। সেটা গল্পের মজা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

অনেক অনেক দিন আগে নাকি বগা লেকের স্থানটিতে সাতটি পরিবার বাস করতো। তখনও লেকটি সৃষ্টি হয়নি। হঠাৎ এক সময় প্রায় প্রত্যেকদিনই রাতে তাদের গরু ছাগল কে যেন খেয়ে ফেলতে লাগল। তারা তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলো। অবশেষে রাতে পালা করে পাহারা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। প্রথম রাতেই পাহারা দলের কাছে মূল ঘটনা স্পষ্ট হলো, তারা দেখল

একটি সাপ এসে প্রতি রাতে এই কাজ করছে। সাপটি বাস করে একটি গর্তের মধ্যে। তারা গর্তের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়ে তা পেয়েও গেলো। গর্তটি খুঁজে পাবার পর তারা সেখানে বঁড়শি পাতল। বঁড়শিতে গাথল সাপের মুখ। এরপর টেনে তোলার পালা। সাত দিন সাতরাত সবাই মিলে কেবল টানল আর টানল, তাও সাপের শেষ নেই। আর না পেরে তারা যতদূর টেনে তুলেছিল সেইখানে কোপ দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর সেই তোলা অংশ কেটে সব পরিবার ভাগ করে নিল খাওয়ার জন্যে।

এখন যে জায়গাটিতে বগা লেক আর্মি ক্যাম্প। সেই পাহাড়টির উপরে বাস করত এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলা। বিধবা মহিলাটির ভাগে পড়ল সাপের মাথা। আশ্চর্য মহিলাটি যখন মাথা কুটিকুটি করতে গেলো, কাটা মাথা কথা বলে উঠল। বলল, আমার চোখ গুলো কেটোনা। তাহলে তোমার ক্ষতি হবে। বিধাব ভয় পেয়ে মাথাটা না কেটে তখনকার মত উঠিয়ে রাখল। রাতে আবার কথা বলল মাথাটি। চোখ জ্বলছিল তার। বলল, তোমাদের গ্রামে আজকে অতিথি এসেছে না।

বিধবা নিজের মাথা নাড়ল। সাপের মাথাটা বলল, ওদের কে রাতের মধ্যে বিদায় হতো বল। না হলে সকালে সবার সাথে ওরাও মারা যাবে, আর তুমি এই পাহাড়ের উপর থাকবে, তোমার কিছু হবেনা।

পরদিন সকালেই এই লেকের সৃষ্টি হয় আর পুরো গ্রাম তলিয়ে যায়। বিধবাও একা একা বেঁচে কি লাভ ভেবে লেকের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরে যায়।

সেই থেকে এই লেকের সৃষ্টি। এক রাতের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই অপূর্ব নিসর্গ লেকখানা। খাসা গল্প। সাপের সেই বাকী অংশ নাকি লেকের মাঝে এখনও আছে। দেখেছে অনেকেই ।

বেবি বলেছিল ও নিজেও ওটা বিশ্বাস করে।

রেশাদ সেই পুরাতন কথা মনে করে বগার পানি চোখের সামনে দৃশ্যমান হতেই বলল, বেবি সাপের মাথাটা কিন্তু এবার খুঁজে বের করতে হবেই।

সে দাদা তুমি পারবে না, মনে আছে তো পানির তলে কি পিচ্ছিল পাথর, একবার পিছলালে একেবারে নিচে কোথায় যে পৌঁছাবে কেও জানে না।

তবে রং বদলানোর বিষয়টা যে সত্যি সেটা জানে রেশাদ , নিজে দেখেছে , কখনও ঘোলা হয় আবার বেশীর ভাগ সময় তো একদম স্বচ্ছ টলটলে। যার যা বিষয়ই থাকুক না কেনো এ এক আজব লেক। এত উঁচুতে এত সুন্দর সমরূপ এবং এত গভীর লেক খুবই বিরল। এসব জানে রেশাদ। এ লেকের প্রতি তার আকর্ষনের মাত্র সে কারনেই বেড়ে থাকবে হয়তো।

আজব হবে না কেনো। যে বেবীকে আসলেই সে নিজে ছোট বোনদের সাথে কোন তফাতে দেখে না, সেও এই লেকের ধারে সেবার রাতে অদ্ভুত এক কান্ড করে বসল।

রেশাদ একা তার থাকার ঘরটিতে বসেছিল। খুব মনে পড়ছিল সৃজয়ার কথা। জানালা দিয়ে বগার দিকে তাকিয়ে আর্ধেক চাঁদটির জলে হালকা তরঙের সাথে হেলেদুলে নৃত্য করতে দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল আর ভাবছিল সে মুগ্ধতায় সৃজয়ার থাকার প্রয়োজন ছিল খুব। কিছু কিছু সময় থাকে মনের গভীর প্রয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আপনাতেই উপলব্ধি হয়। এ যেন সেই সময়। সৃজয়ার সাথে তার জীবনে চাঁদের আলোর এত মধুর সব স্মৃতি কখনই পিছ ছাড়বে না , জানে সে ভালো করেই।

বেবি, রয়েল আর সেবার সাথে থাকা আরও চারজন বম সঙ্গী সবাই রাতে ওদের পাহাড়ের পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে তৈরী কোন নেশা জাতীয় পানিয় খেয়ে টাল টাল হয়ে নিজ নিজ ঢং এ রাত কাটানোর চেষ্টায় মত্ত ছিল। বেবী বড় ভাইয়ের আদেশ অক্ষরে পালন করার মানসে তবুও খোঁজ নিতে এসেছিল রেশাদের থাকার ঘরটিতে। রেশাদের সামনে এসেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে পড়ে যায় সে। বাধ্য হয়ে রেশাদ তাকে কোলে নিয়ে বিছানায় যখন শুয়ে দিতে যাবে ঠিক তখনই রেশাদের গালে মেয়েটা ঠোঁট ছুইয়ে বলে ওঠে, তোমাকে ভালবাসি।

রেশাদ বিমূর্ত থেকে ক্ষনিক সব সামলে নেয়। সকালে বগার ধারে বসে বেবি খুব সাদামাটা ভাবে বুঝায়। সৃজয়ার সাথে প্রেমের গোড়ার দিকের কথা তোলে সেদিন রেশাদ। কারন রেশাদ জানে এ রোগ একবার বাড়তে দিলে দ্রুত তার ডালপালা গজাতে থাকেই।

বেবী তুমি তো জান , তোমার ভাই এর সাথে আমি আমার অবস্থান রিপ্লেস করেছি কেনো? ও তোমাদের এই অনুন্নত পাহাড়ের সৌন্দর্য বিরূপ হয়ে ঢাকায় চলে গেছে। চলে গেছে চিরতরে। আর আমি এসেছি সেই সভ্যতার চরম যাতাকল হতে মুক্ত হয়ে খোলা এ প্রান্তরে। তুমি আমার ছোট বোনদের মতই। আসলে ছোট বোনই তো। তুমি আমার কাছে আরেকজন রুমকী, আরেকজন শিমকী। কথাটা মনে রেখো। আর মনে রেখো ভালবাসার অতটা প্রয়োজন পৃথিবীতে নেই। ও দূর্বল করে দেয় মানুষকে, বন্দী করে দেয় ক্ষুদ্র সীমানায়। তারপরও যদি কাউকে মনে রাখতেই হয়, সে আছে, থাকবে সৃজয়া।

সূর্যটা সেই অনেকক্ষণ ধরে শিমকীর মিষ্টি চেহারাটায় উজ্জ্বল আলো ফেলছিল। তার রূপের সুষমায় মুগ্ধ হতে হতে ব্যালেন্স হারিয়ে একটু আগে সেটা ছয় তলা দালানটির ওপাশে টুপ করে পড়ে গেছে। কোমল ত্বকে সূর্যের সেই আগ্রাসী আদর একটুও কাবু করেনি তাকে। দৃষ্টি তার তীর্থের কাকের মত অপেক্ষায় আজ বিকেল বিশেষ কারও। অস্থিরতার স্রোত মন সাগরে গতি পাচ্ছে ক্রমাগতই।

বারান্দার রেলিংটা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে শিমকী। অনেকক্ষন ধরেই। চোখ দুটো পারলে রেলিং ভেদ করে চলে যেতো অপাশে। দৃষ্টি একটা বিশেষ জায়গায় নিবিষ্ট তার। একটুও পলক না ফেলে থাকতে পারলে তাই সে করত। মিস করা যাবে না। বারবার মনে হচ্ছে এই বুঝি চলে এল সায়ান।

শিমকীদের বাসাটা তিন তলায়। সামনে সরু গলি ওপারে চারতলা আরেকটি দালান। সেই দালানটা ডানে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গলিটা বিভাজন হয়ে বামে চলে গেছে। গলি ওপারেই আরেকটি দালান। এই দুই দালানের ফাঁক গলেই তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে শ'খানেক গজ দূরে একটি সিঁড়ি কোঠায়। ওটাই সায়ানদের বাসা। ওদের নিজেদের বাসা। তিনতলায় পুরোটা ফ্লাট জুড়ে ওরা থাকে। শিমকীর বারান্দা থেকে অবশ্য ও বাড়ীর সিড়ি ঘরে ঢোকার পথটুকুই কেবল দেখা যায়।

খুব উৎকণ্ঠায় কেটেছে গত দুদিন। সায়ান যে হাসপাতালে আছে সেটা থেকে খূব দূরে নয়। শিমকীর কলেজ থেকে খুব বেশী হলে মাত্র পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়ার পথ। অথচ সায়ানকে দেখতে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে? একা যাবে, নানান প্রশ্ন ছুটে আসবে, কে জবাব দেবে সে সবের।

একটা শব্দ হলো ডানের রাস্তায়, বাম দিক দিয়ে হালকা গতিতে এগিয়ে আসছিল একটি মাইক্রোবাস। হতে পারে সায়না ফিরছে ওটাতে। দৃষ্টি কেড়ে নিল শব্দ। বেশ গতিতে একটা হোন্ডা মাইক্রোবাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে ফুটপাতের কোনায় বাদাম ওয়ালার ভ্যানটাকে গুতো দিতেই উল্টে গেলো ভ্যানটা। হোন্ডাওয়ালা এক্সপার্ট বলেই তাল না হারিয়ে চলে গেলো, পার হয়ে চলে গেলো নিমিষে সায়ানদের বাড়ী ছাড়িয়ে আরও দূরে। রাস্তার উপর, ফুটপাতের পাশে দশফুট বাই দশফুট ঘাসের আস্তরনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাদাম আর বুট ভাজা। বাদাম ওয়ালা চিৎকার করে হোন্ডা ওয়ালার গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। ক'টা ফুটপাতের বালক বালিকা জুটে গেলো। বাদাম কুড়াচ্ছে তাড়াও। বাদাম ওয়ালা বাদাম ভাজার লাঠি নিয়ে বাদাম কুড়ানো বাদে তাদের তাড়াতে ব্যস্ত হলো।

ওদিক থেকে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল শিমকী। যদি এই পথ দিয়ে না আসে।

মাইক্রোবাসটিও অন্য রাস্তায় মোড় নিল। অন্য সময় হলে হয়তো বাদাম ওয়ালাকে সমবেদনা দিতে ছুটে যেত শিমকী। এখন তো অসম্ভব। তবুও

মাথায় ঘুরছে বিষয়টা। হোন্ডা ওয়ালা থেমে একটা সরিও তো বলতে পারত। সায়ান যদি এমন একটা ঘটনা ঘটাতো? দূর সায়ানতো হোন্ডাই চালাতে জানে না। অতটা বেয়াড়া সাহস ওর হয়নি। হতে কতক্ষণ। এই তো সেদিনও দেখেছে সে ছানা মিয়ার চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে সায়ান। একবারে জমপেশ আড্ডা। ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে অনেক বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে মনে ভাবল, বেশী বাড়তে দেয়া যাবে না। সময় থাকতেই কেটে দিতে হবে উগ্র ডাল পালা এবং এটা তারই দায়িত্ব।

আসছে না কোনো? সন্ধ্যার আগেই তো আসার কথা। সায়মা আপু তেমনই তো জানিয়েছেন। নাকি অবস্থার কোন অবনতি হলো! মনে নানা উদ্ভট চিন্তা আসতে শুরু করেছে এবার। পয়জনের সাইড এফেক্ট যদি থেকে যায় শরীরে। অথবা এই ভীতি মানসিক কোন বিপর্যয় ঘটায়। খুব স্বাভাবিত সেটা জানে শিমকী। বন্ধুদের কাছে হিউমিলিয়েট হবার এক সম্ভাবনা থাকে। এটা বাংগালীদের আরেকটা কমন সমস্যা। অন্যও মানসিক অবস্থা বিচার করে কেউ কাজ করে না এখানে। ভাবেই না একজন বিপদ ফেরা মানুষের সাথে কি ব্যবহার করা উচিৎ। উন্নত বিশ্ব থেকে এই ব্যবহার জনিত শিক্ষা আমরা কখনই লাভ করতে পারি না কেনো? সত্যি তো। দেখা যাবে সুস্থ সায়ানকে দেখে নিজেও ওর সাথে অজান্তেই ঠাট্টা মশকরা শুরু করে দিয়েছি।। অবশ্য তার নিজের কথা আলাদা। এ মনে যে সত্যিকার ভালবাসা ওরই জন্য।

এসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখ স্পষ্ট দেখল একটা প্রাইভেট কার এসে থামল সায়ানদের বাসার সামনে।

চিনল। কিন্তু কারটা যেভাবে থামল তাতে কে নামল দেখার উপায় থাকল না। ঐ তো, ঐ তো সায়ানের মাথাটুকু দেখা গেলো এক ঝলক। চিনল শিমকী, চিনল এবং দুদিনের চরম দুশ্চিন্তায় ভাটা পড়ল তবুও হঠাৎ বেড়ে গেলো অস্থিরতা।

আপি চলো না, সায়মা আপুদের বাসা থেকে ঘুরে আসি।
কেনো?
ও মা! তুমি জানো না, সায়ান ভাইয়াকে বাসায় নিয়ে এসেছে।
তাই, তা তুই জানলি কি করে।

শিমকী হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো। ঠিক বুঝতে পারছে না আপিকে কি বললে আপি অন্য কোন সন্দেহ করবে না।

ভুলে গেলে, কাল সায়মা আপু বলছিল না আজকে সায়ান ভাইয়াকে বাসায় নিয়ে আসবে।

আগামীকাল তো শুক্রবার, ছুটির দিন, সকালে যাব।

না, চলো না , আজকেই...

এত উদ্বিগ্ন কেন, কিরে শিমকী! বলতো সত্যি করে, বলতো কি হয়েছে, আমি যা ভাবছি তা না তো...

কি ভাবছ তুমি আমি তা কি করে বলব, সায়ান ভাইয়া আামাদের বাসায় কত আসে, ওনার এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো, অজ্ঞান পার্টির কাছে কুপোকাত হলো; দেখার ইচ্ছে হবে না। কেনো, তোমার প্রিয় বান্ধবীর ছোট ভাই, তোমার তো একটা দায়িত্ববোধ থাকা উচিৎ, আফটার অল তোমাদের নোট চালাচালি সব তো ঐ ভাইয়াই করে দিয়েছে এতকাল।

হুম, তবে সায়ান কিন্তু তোর সাথে মানাতো ভালো, ভাল লাগলে বলে ফেল আমাকে, ব্যবস্থা কিন্তু আমারই করা লাগবে।

আপি, বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। নিজের চিন্তা করছ তাই বল। আমি জানি আজকাল তুমি ও বাড়ীতে যেতে লজ্জা পাও। তুমি মনে করেছে আমি জানি না। আমার বুদ্ধি খুবই ভালো। সায়মা আপুর মামার জন্য তোমার বিয়ের কথা উঠতেই তুমি ও বাড়ীকে হবু কিছু একটা ভাবতে শুরু করেছে।

কোথায় গাছ আর কোথায় তার কাঁঠাল, উনি খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন! তোকে কে বলেছে রে।

তুমি নিজেই ।

মানে, কখন।

বাহ্‌রে, সায়মা আপুকে জিজ্ঞেস করছিলে না, সায়মা তোর মামা জীবনে কটা প্রেম করেছে রে?

দাঁড়া শয়তান, লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শোনা হয়েছে, না।

লুকিয়ে না মোটেও, তুমি আমাকে দেখে ভেবেছ আমি ছোট মানুষ কি আর বুঝি।

তা এত বুঝদার বোন আমার, সায়ানের প্রতি এত দরদ কবে থেকে সেটাও একটু বুঝাও আমাকে।

আপু, আবার! আাচ্ছা অজ্ঞান এর বিপরীত শব্দ কি হবে আপু? জ্ঞান অবশ্যই। তাহলে অজ্ঞান পার্টির বিপরীত হলো জ্ঞান পার্টি। এমন একটা জ্ঞান পার্টি থাকলে ভালো হতো না , কি বলো? রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছি , হঠাৎ সামনে একদল জ্ঞান পার্টি, মুহূর্তে কিছু একটা চোখে ছুড়ে মারল আর জ্ঞান এর একটা গাছ গজিয়ে গেলো মাথার ভেতর।

চুপ! আমার ওসব পাগলামী শোনার সময় নেই, সকালে যাব, এখন পড়তে বস।

খুব টেনশন হচ্ছে, সায়মা আপুনকে ফোন করে জানা যায়তো নিয়ে এসেছে কিনা?

আচ্ছা চল।

আপি জান, খুব ভাল একটা জিনিস হয়েছে ওনারে অজ্ঞান পার্টি ধরায়। উনি আইইএলটিএস পরীক্ষাটা দিতে পারে নাই।

ভালোর কি হলো।

বাহ্‌রে! ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, ক'মাস পড়েও ফেলল, কেনো কি হবে বিদেশে গিয়ে আজাইরা।

দূর এ দেশে এমনেতেই চাকুরী পাওয়া দুষ্কর, তারউপর ঐ সব স্ট্যাটিসটিকস ফিকসে পড়ে কিচ্ছু হবে না। আমরা ডাক্তারী পড়েই ভয় পাচ্ছি, কি করব, কই চাকুরী করব। এতদিন ছাত্রী ছিলাম, ভালো ছিলাম, পাসের সময় এগিয়ে আসছে আর এখন দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তার চেয়ে বাইরেই যাওয়া ভালো।

তাইলে আপু ইন্টার পাসের পর আমারও তো বিদেশ পড়তে যাওয়া উচিৎ, তাই না?

কিন্তু তুই যে মেয়ে...

আপি, মেয়ে বলে...

চুপ, আমার আপত্তি নেই, আপত্তি করবে তো মা, মনে নেই...

বাদ দে তো ওসব কথা এখন।

চল, আগে তোর টেনশন দূর করি,না গেলে সায়ানের চিন্তায় কখন বিনা পয়জনে তুই আবার জ্ঞান হারাবি কে জানে।

সায়ানদের বাড়ীর সামনের গলির পরেরটাই শিকমীদের বাসায় যাবার গলি, এই গলি দুটো পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে যাবার জন্য ডানে মোড় নিলেই একটা ছোট পার্ক। খুবই ছোট । তবুও এই অবিশ্বাস্য রকমভাবে বেড়ে ওঠা ইট পাথরের ঢাকায় সেটাই এ এলাকার গ্রীণহার্ট। সকালে বিকেলে লোকজন এখানে হাঁটাহাঁটি করে। শরীর চর্চা করে কেউ কেউ আবার দুপুরের তপ্ত

রোদের গোপন সময়ে কেউ খেলে প্রেমলীলা। পার্কটার একটা নাম আছে। ধ্যানার পার্ক। এই ধ্যানা এই এলাকার এক অস্পষ্ট চরিত্র। কারও কাছে ধ্যানা বিবাগী রাজকুমার, কারও কাছে আরব থেকে আসা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, কারও কাছে ফুটপাতের পাগল। স্বভাবতই ধ্যানা মিয়ার সম্পর্কে লোকমুখে কাহিনীর অভাব নেই। সায়ানও এমন একটা কাহিনী জানে। ওটাই সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং ভীরু সংশয় মানুষ সেটাকে বিশ্বাসে স্থায়ীত্ব দিয়ে চলেছে। সমস্যা এখানেই, সমাজে এই ভীরু সংশয়পূর্ণ মানুষই বেশী। সায়ান নিজেও জানে না কখন সে এই কাহিনী মনে স্থান দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দিয়েছে তো অবশ্যই। অত ভাবা ভাবীর মধ্যে সায়ান নেই। সবাই মেনে নিয়েছে, তাই সেও মেনে নিয়েছে।

হয়তো কখনও যাবেই না সে পার্কের পশ্চিমে সরু পথ টা ধরে ধ্যানার মাজারে। ঢুকেও নি কখনও। দূর থেকে দেখেছে লাল সালুর তলে একটা পাকা কবর। চারপাশে আগর আর মোমবাতির জ্বলছেই অনবরত। হুলুস্থুল কান্ড। সে যাক না যাক শত শত মানুষ রোজ যাচ্ছে, সেখানে বিত্তবান বা বিত্তহীনদের নাম আলাদা করে বলা যাবে না। সবাই যাচ্ছে, কেউ সেজদা করছে লালসালুর ছায়ায়, কেউ রক্ষিত বাক্সে ফেলছে টাকা, কেউ নিচ্ছে খাদেম নামের এক জটাধরীর হাত থেকে তাবিজ কিংবা লাল হলুদ সূতা। রিকশা ওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতে এক হাত উঁচিয়ে চুম খাওয়ার চেষ্টা করছে। ঐ যে-বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। ওখানেই ভীরু মানুষের সমস্যা।

সায়ানের কোন সমস্যা নেই। সে শুধু জানে তার তো প্রয়োজন নেই। তবুও চোখ তার ঠিকই লাল সালুর দিকে চলে যায়। এখানে এলেই চোখ যায়। তখন মন তার ভাবার চেষ্টা করে সাদা শুভ্র দাড়িতে একটা লোক বসে আছে। ধ্যান করছে, কোন কথা নেই তার মুখে। কোন চাহনি নেই। চাহনি নেই বলে রাগ ক্রোধের বালাই নেই। অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ তাকে দেখছে, সামনে একটা পুকুর। সেখানে পানিতে ভাসছে লাল পদ্ম ফুল। আধ্যাত্মিক লোকটি ধ্যান করেই চলেছে, বহু বছর ধরে, সে ঐ পুকুর পারেই পাকুর গাছের নিচে পড়ে থাকে। সেই পাকুর গাছটি এখনও আছে, তার তলেই মাজার আর মাজারের উপরে ঝালর ওয়ালা লাল কাপড় এর আচ্ছাদন। কেউ নাম জানতো না বলে তার নাম দিয়েছিল ধ্যানা মিয়া। তার পা ছুঁয়ে এলে হাতের ব্যাথা ভাল হয়ে যায়, গায়ের ধূলো এনে লাগালে ভাল হয়ে যায় যুগ যুগের ঘা পাঁচড়া সব। সায়ানের ওসব বিশ্বাস না হলেও এসবই যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিশ্বাস। হঠাৎ সায়ান দেখে সেই পুকুর এর ধারে দু'দল ব্যক্তিবর্গ পুকুর এর দখল নিয়ে মারামারি করছে। সেই প্রথম নাকি ধ্যান ভেঙেছিল ধ্যানা মিয়ার। চোখ খুলে মারামারি দেখে রেগ যান ধ্যানা; তার পর সবাই কে হাতে ইশারায় চলে যেতে বলেন। সকালে পুকুর টি দেখেতে পায় না কেউ আর, এক রাতেই ধ্যানা পীরের ক্রোধে জল শুকিয়ে ভরে যায় পুকুরটি, প্রতিটি পদ্ম ফুল হতে জেগে

ওঠে এক একটা বড় বড় গাছ। সেই সব গাছই আজকের এই পার্ক এ নাকি দেখা যাচ্ছে। এসবই ধ্যানা মিয়ার ক্রোধের উপহার। পুকরের দখল নিতে আর কেউ কোনদিন আসেনি। ধ্যানার ধ্যানেও আর কোনদিন কোন বাধা পড়েনি।

পার্কটির সামনে ইংরেজী এল শেপের মত খানিকটা ফাঁকা জায়গা। এরই পশ্চিম পাশ দিয়ে ধ্যানার মাজারে প্রবেশের পথ, নকশা করা দেয়ালটা পার্ক আর মাজারকে পৃথক করে রেখেছে। এল শেপের অন্য প্রান্তে এককোনায় ছানা মিয়ার চায়ের দোকান। বেশ সুনাম ছানা মিয়ার চায়ের। অত্র এলাকার সকল কিশোর তরুণের আড্ডার হাতেখড়ি এই চায়ের দোকান আর পার্ক ঘিরেই শুরু হয়। এই রাস্তার মোড়টির আরেকটি বাড়তি সুবিধা আছে। সেটা উঠতি বয়সের ছেলেদের জন্য। এই রাস্তা ধরেই সকালে বিকেলে বড় রাস্তার গালর্স স্কুল এন্ড কলেজের মেয়েগুলো যাতায়াত করে। কত যে প্রেমের শুরু এই স্থানেই আর কত যে পতনও এখানেই তার হদিস কেই বা রাখে। এত প্রাণ চঞ্চলতার মাঝে এখানে মারামারি আর খুন খারাবীর ইতিহাসও বেশ বড়। তবে ইদানীং পুরো বাংলাদেশের মত ছোটখাট মারামারি আর খুন টুন এখানেও কমেছে। সায়ান আগে এখানে খুব একটা দাঁড়াত না। ভার্সিটিতে ভর্তির পরই তার দাঁড়ানোর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত।

ডুবে যাওয়ার আগে সূর্য শেষবারের মত ভূবনের সাথে আলো বিনিময় করে নিচ্ছে। সেই পড়ন্ত বেলায় ছানা মিয়ার চায়ের দোকানের ডানে দাড়িয়ে আড্ডা রত পাঁচটি ছেলের মধ্যে আবীর নামের ছেলেটা পরপর দুটো অজ্ঞান পার্টির ঘটনা বলে গেলো। সব আড্ডাতেই কিছু লোক থাকে যারা কেবল বলতেই চায় আর অন্যরা বলার সুযোগই পায় না। তারা আবার সব জানে, যে বিষয়ই সামনে আসবে সে বিষয়ে তার অগাধ অভিজ্ঞতা।

আরে আবীর, এর চেয়ে আরও মজার এক টা ঘটনা ঘটেছিল আমার এক চাচার..অন্যকে বলার সুযোগকি আর আবীর দেয়, থামিয়ে দিয়ে নিজেই আবার বলে চলল, আসল ঘটনাটাই তো বলা হলো না। আমার চাচার বন্ধুও তো এই তো সেদিন, মাত্র এক মাস আগে। উনি বুঝেছিস সো জিনিয়াস। জাহাঙ্গীর নগরের টিচার। ছুটিতে বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, বুঝলি, ট্রেনে যাচ্ছিলেন ভৈরব। ছুটি মাত্র দুদিনের। ছুটি শেষ উনি তে আর ফেরেন না। বাড়ীতে ফোন করা হলো, না কেউ কিছু বলতে পারে না। বাড়ীর লোকজন তো জানেই না তার বাড়ী যাওয়র কথা। কি আশ্চর্য। তারপর খোঁজা খুঁজি পড়ে গেলো। জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটির বন বাঁদারের ফাঁকে ফাঁকেও চষে বেড়ানো হলো। তারপর তারে পাওয়া গেলো ভৈরব স্টেশনে। তিনি দুদিন ধরে প্লাট ফর্মে শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। গায়ের জামা কাপড় নোংরা ধুলোয় একাকার। পুরা পাগল পাগল চেহারা। ওনারে কি খাইয়েছিলো জানিস। কলা, একটা কলা। ঐ পর্যন্ত উনি মনে করতে পেরেছিলেন।

কি আবীর আরও দুএকটা বলবি না হলে সায়ানের কাছ থেকে একটু শুনি।

হুম হুম নয়ন ঠিকই বলেছে, হি ইজ রাইট।

তা শুনবি না, কলা কি করে খেলেন তিনি? আসল মজাটাই তো ওখানে...

বাদ দে তো, পরীক্ষাটা দেয়া হলো না। অতগুলো টাকা নষ্ট হলো। কবে আবার পরীক্ষাটা দেবো, লন্ডন যাওয়াটা পিছিয়ে গেলো। একবার ভাবছিলাম ব্যাটারে ফোনটা না দিলেই হতো। কেনো যে দিলাম। না দিলেও তো সূচ ফোটাতে পারত , তাই না? আসলে কিছু করার থাকে না।

হুঁ! কই আমারে তো কোন দিন ধরে নাই।

যেদিন ধরবে আবীর সেই দিন বুঝবি। নিজের কাহিনীই বলে বেড়াতে পারবি তখন।

দূর নয়ন, তোগোর মত ভোদাই মার্কা চেহারা নিয়া আমি চলি না।

তার মানে তুই সায়ানকে ভোদাই বললি।

হয়েছে তোরা এই নিয়ে ঝগড়া করছিস কেনো। কে কখন ভোদাই হবে কেউ বলতে পারে। আমি তো লোকটার উপকার করতেই ফোন টা দিয়েছিলাম। আর অত ভাবার তখন সময় কই। মনে মনে ইংরেজী চর্চা করছিলাম...

হু, ওরা কিন্তু মানুষের এই অ্যাবসেন্ট মাইন্ড মুহূর্ত গুলো বুঝে। একদম ট্রেনিং প্রাপ্ত। ঠিক বুঝে যায় কে অন্যমনস্ক আছে।

সুর্যের মুখে তখন ঘন লাল হাসি। সে স্বার্থকতার সাথে একটা দিন পার করে দিয়েছে। এখন বিদায়ের বেলা।

পাঁচ বন্ধুর আড্ডা তখন তুঙ্গে । সায়ানই মূল উপাত্ত আজ আড্ডার । তাই খেয়াল করেনি কখন সাদা ধবধবে কলেজ ড্রেসে একটা মেয়ে খুব কাছে এসে ডাকছে, সায়ান ভাইয়া একটু শুনে যাও, কথা আছে।

সায়ান বাদে বাকী আট জোড়া চোখ হঠাৎ আকারে বড় হয়ে উঠল। সায়ান নির্লিপ্ত। বন্ধুরা সকলে সমস্বরে বলে উঠল, হুঁ...হুঁ, তলে তলে..কে রে সায়ান? ভাবী বলব নাকি?

চুপ, ও রুমকী আপুর ছোট বোন, আপুর কোন কাজে হয়তো ডাকছে। দাঁড়া শুনে আসি।

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে আস। আমার সময় লাগবে।

ওরা কি ভাববে!

বললাম না যাও।

আরে খবরদারি করছ কেনো।

খবরদারির দেখেছো কি?

মানে? মানে বোঝনা, এই ধ্যানা আর ছানার সামনে আড্ডা দেয়া শুরু করেছো কেনো? এসব বাদ দিতে হবে। ধীরে ধীরে দিলেও চলবে। ধ্যানা মিয়ার মাজারে আবার পূজো দিতে যাও না তো ?

পূজো! মুসলমানরা পূজো করে নাকি? যার যা বিশ্বাস। ও নিয়ে ফাজলামি করছ কেনো?

তাইলে তুমিও ঐ ধ্যানা ভন্ডের কাহিনী বিশ্বাস কর। ছাগল কোথাকার।

বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে কথা আসছে কেনো? আজগুবি ঘটনাকি পৃথিবীতে ঘটে না? ঘটে তো।

রেশাদ ভাইয়ারা কয় বন্ধু মিলে একবার ঐ ধ্যানারে নিয়ে গবেষণায় নেমেছিল। ঐ ধ্যানা ওপার থেকে আসা এক আধপাগলা শিখ। ভারত বর্ষ স্বাধীন হবার কালে কোন ভাবে সে এইখানে আটকা পড়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে পুরা পাগলা হবার পরে তার একমাত্র কাজ হয়ে পড়ে পড়ে সিদ্ধি খাওয়া। সিদ্ধি মানে তোমরা তো আবার গানজা বল। খেয়ে সে একদিন এইখানে বনের ধারে মরে পড়ে থাকে। তারপর একদল পথের বাসিন্দা তারে কবর দেয় ঐ পাকুর গাছের তলে। তারপর যা হয় কালের আবর্তে গানজাখোর হয়ে গেলো ধ্যানা পীর।

এত কিছু তোমার ভাইয়েরা জেনে গেলো,তা কাউকে বলল না কেনো। পঞ্চায়েত কমিটিকে বলেছিল। সামাল দিতে পারে নি। বিশ্বাসে ঘুন ধরাতে হলে কেবল বিশ্বাস পাল্টালে হয় না, পোকাটাকেও মারতে হয়। ভাইয়াদের জন্য সেটা কঠিন ছিল।

বাই দ্যা ওয়ে তুমি গানজা টেনেছো কখনও?.....নিরবতাই সম্মতির লক্ষণ। তাই না জাদু। খুব ভাল করেছো। আর খাবানা। যা খেতে মন চায় আমার সাথে আমার সামনে এক সাথে খাবা। ঠিক আছে।

খবরদারী আবার বেশী হয়ে যাচ্ছে না?

যাচ্ছে, যাবে। ছানার মিয়ার চা খাবা আর আমার খবরদারী শুনবা না তা হবে না , তা হবে না। তা ছানা মিয়া কে বল দেখি?

ছানা মিয়া নিয়েও তোমার ভাই জানেরা গবেষনা করেছেন নাকি। আমার তো মনে হয় এখানে কোন এক সময় ছানা দিয়ে বোধহয় চা বানাতো টানাতো..এমন কিছু হবে।

পুরা একটা গাধা। ছানা দিয়ে চা বানায়, শুনছ কোনদিন। তোমারে অজ্ঞান বানাবে না তো কি, একদম ঠিক হইছে।

তাই না, তা জ্ঞান আর না ফিরলে খুশি হতে বুঝি?

সেটা সময় বলে দিত। শোন ছানা মিয়ার কাহিনী আমি জানি। তুমি জেনে কাল আমাকে জানাবে। এইটা তোমার জন্য আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। একটা খাতা কিনবে, মোটা দেখে কিনো। যতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট দেবো সব ওখানে সিরিয়াল করে লিখে রাখবে। পাশে থাকবে প্রতিটার প্রাপ্ত নম্বর। ভবিষ্যতে কড়ায় গন্ডায় হিসেব হবে । এবার শোন যে কারনে ডেকেছি। ওদের বিদায় দিয়ে এলে না!

লাগবে না। তুমি চলে গেলে আমি আবার ওখানেই ফিরব।

তিনদিন অজ্ঞান থেকেও হুস হয়নি।

তিনদিন না, দেড়দিন মাত্র।

হুম। এখনও তো মনে হচ্ছে হুঁস হয়নি। এবার বল, কাল সন্ধ্যায় যখন তোমাকে দেখতে গেলাম কেনো বললে, আমার চোখ ফোলা ফোলা। তুমি কি ভাবছ আমি তোমার জন্য কেঁদেছি?

কেনো ভাবব, কাল আমার দিকে তাকিয়েই তোমার চোখে পানি এসেছিল। কিন্তু আমার জন্য তুমি এতটা কষ্ট পাও এটা কিন্তু কোনদিন সত্যি মনে আসেনি।

সত্যি আসেনি।

না।

তুমি কি একটুও বুঝতে পারনি?

কি বুঝব?

ঘোড়ার ডিম।

না বল, স্পষ্ট করে বল।

মেয়েরা স্পষ্ট করে বলে না।

ইস ন্যাকামি করছ এখন। আমি আগে না বুঝলেও এখন তো বুঝেছি। অন্তত কাল সন্ধ্যায় তো বটেই।

কি বুঝেছ। বল।

তুমি বল?

না চুপ, তোমাকে বলতে বলছি না।

না, পারবনা।

উহ্‌রে! আমার পুরুষ মানুষ, ছানা মিয়ার দোকানে আড্ডা দেয়ার লায়েক হয়ে গেছে আর মুখে বলতে পারে না- তোমাকে ভালবাসি।

পারলে তোমার মুখ দিয়ে প্রথমে এই মিষ্টি বাক্য দুটো কিভাবে শুনতাম।

উফ! না, না , তুমি আগে বলবে, হবে না, হবে না।

আচ্ছা, ওকে ওকে , চুপ । অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে একটা জিনিস কিন্তু ভালোই হলো। মনের কথা দুজন দুজনাবে বলার সুযোগটা তো এসে গেলো।

তা বটে। তবে তোমার মত এত বুদ্ধিমান একট ছাগল কেমনে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ল? হাসি পাচ্ছে এখন।

কি আমি ছাগল। না তো কি, তবে এই কিউট খোঁচা খোঁচা দাড়িটা একটু যা তফাৎ করে দিয়েছে।

চলো না শিমকী, বড় রাস্তা থেকে ঘুরে আসি।

না, সন্ধ্য হয়ে গেছে। মা চিন্তা করবে। তুমি তো জানই আমার মা কত ভীতু।

আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেনো? পাগল হলে কেনো। কত ঘুরব সামনে তোমার সাথে। খাওয়াবে নাকি। সত্যিকার সম্পর্কে ওসব খাওয়া দাওয়া লাগে না।

না তা ঠিক না, আজ আমাদের প্রেমের যাত্রা শুরু হলো, তোমাকে কিছু একটা না দিলে কেমন হয়।

প্রেম শুরু হলো মানে। বলেছো এখনও মুখে? ভীতুর ডিম্ব।

আর কিভাবে বলব, পাশ্চাত্য স্টাইলে?

ও সেজন্যই তো বিদেশে যেতে চেয়েছিলে। বললেই ওখানের মেয়রো ঠোঁট দুটো এগিয়ে দেবে।

তুমি তো খুব ঝগড়াটে দেখছি।

ঝগড়ার কি দেখেছো। পরে বুঝবা, ঐ যে বাসা দেখা যাচ্ছে। এবার যাও। শোন তোমার পকেটে রুমাল আছে।

হুম। বার কর।

কেনো ।

দাও বলছি।

এই নাও রুমালে আমার ঠোঁটের ছাপ দিয়ে দিলাম। রেখে দিও প্রেমের নিদর্শন হিসাবে। বাই বাই।

শিমকী শোন শোন, আমি তোমাকে ভালবাসি। অনেক ভালবাসি।

শিমকী চলে গেলো দ্রুত। সিঁড়িতে ঢোকার আগে একবার চোখ ফেরাল। সাথে নাড়াল মাথাটাও । সায়ান তাকিয়ে রইল। বুঝল শেষ কথাটা সে শুনেছে। পেছনে আড্ডায় ফিরতে ফিরতে রুমাল টা দু'একবার মুখের কাছে মুখ মোছার ভান করে ঘ্রান নিল। কেনো জান খুব ভাল লাগছে সায়ানের। আকাশে উড়তে উচ্ছে করছে ডানা মেলা পাখির মত।

মনে মনে অনেক কিছু ভাবনা। অনেক স্বপ্ন হঠাৎ সব একসাথে ভর করল। বন্ধুদের দেখতে পেয়েই চিন্তা সূত্র পরিবর্তন হতে চাইল। ভেবে নিল, না কাউকে এখন বলা যাবে না। ওরা তাহলে হাসবে। আরেকটু সময় যাক।

কিরে সায়ান, এতক্ষণ? তার পর অন্ধকার গলির ভেতর...

বন্ধুর এই কথায় রাগ হতে শুরু করলেও কেবল বলল, চুপ। প্লিজ, ভদ্র একটা মেয়েকে নিয়ে এসব না বললে কি হয় না?

আবীর বলে উঠল, ছেলেরা আড্ডায় কোন মেয়েকে ছেড়ে দেয় বলতো?

বাদ দেতো, ছোট চাচা বিকেলে ফোন দিয়েছিল, ঐ লোকটা ধরা পড়েছে।

কোন লোকটা।

আরে যে ব্যাটা আমারে অজ্ঞান করেছিল।

দেখেছিস বাংলাদেশের পুলিশ কি না পারে? চাইলে সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলতে পারে।

হুঁ! ওমন মামু থাকলে হয় তো বটেই, নয়ন কথাটা বলেই ফেলল।

আড়াই বছর চাকুরী জীবনে শাহেদ অজ্ঞান পার্টির অনেক সদস্যকেই পাকড়াও করেছে। তবে বেশীর ভাগের ক্ষেত্রেই অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি। এগোতে পারেনি বেশীদূর। অল্প যে ক'টা তে প্রমান পাওয়া গেছে দেখা গেছে কোন এক অদৃশ্য শক্তির জোরে জামিন নিয়ে সটকে পড়েছে, মামলা উঠেই নি আর কোনদিন। টাকা দিয়ে সব ডিসমিস করার গোপন নীতি এই পুলিশের চাকুরী না পেলে তার আসলে জানাই হত না ।

এবারের ঘটনাতো আলাদা। ভিকটিম তার আপন ভাগ্নে।

অবশেষে ঐ দ্বিখন্ডিত মোচ ব্যাটাকে শেষরাতের অভিযানে পাকড়াও করতে পেরেছে শাহেদ। সায়নারে দৃষ্টিও ধোঁকা খায়নি, ঠিক মতো আইডেন্টিফাই করেছে। শাহেদ অবশ্য সায়ানকে অপরাধীটির সামনে আনার আগেই মাথায় একটা অন্যরকম বুদ্ধি নিয়ে নাড়া চাড়া শুরু করে দিয়েছিল। যে কারনে সায়ানকে ঐ ব্যাটার দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে নি সে। দূর থেকে দেখিয়েছে।

খুব প্রচলিত একটা ধারণা আছে, বাংলাদেশের পুলিশ আসলে সবই জানে, সবই বোঝে, চাপে আর টাকার লোভ বা প্রয়োজন তাদের সেই জানার কোন সুফল জাতিকে দিতে দেয় না। কথা মিথ্যে না, মনে মনে ভাবল শাহেদ। এইতো মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যেই ঠিকই লোকটাকে ধরে আনলো। কিন্তু প্রমান যে করতে পারবে না, সেটাও সে ভালোই জানে। এদের মূল খুব গভীরে।

অপরাধ করার যে সাহস লাগে তার জন্য গভীর মূল না হলে কি হয়। পুলিশরা কি করবে। ঐ যে সে কারনে রিমান্ড আর রিমান্ড না পেলে আগেই ইচ্ছেমতো ধোলাই দিয়ে মনের খায়েশ মিটিয়ে নেয়।

ব্যাটাকে নিয়ে আসেন টর্চার রুমে, থানার ইনচার্জ কাদেরকে ফোন করে আদেশটা দিলো শাহেদ।

শাহেদ রেডি হয়ে টর্চার রুমের দিকে পা পাড়াবে ঠিক সেই সময় থানার ইনচার্জ কাদের নিজেই এসে হাজির ।

কি, ব্যাটাকে বেঁধেছেন?

না, স্যার একটু সমস্যা হয়েছে।

কি রকম? তাড়াতাড়ি বলেন।

স্যার, একজন স্থানীয় নেতা ফোন দিয়েছিলেন।

আচ্ছা। কি বলে- এই ব্যাটা তার লোক, ছেড়ে দিতে হবে!

না , ঠিক তা না স্যার, সকালেই কোর্টে চালান দিতে বলল, ওখান থেকে জামিন এ ছাড়িয়ে নেবেন উনি।

খুব সম্মান দিয়ে এ নেতার নাম উচ্চারণ করছেন। চেনেন নাকি পারসনালি। কোন দলের?

স্যার আপনিও চেনেন। সরকারী দলের নেতা। মিথ্যে মামলা আছে ৭ টা, চারটে খুনের মামলা তার মধ্যে। সবগুলোতেই সে জামিন পেয়েছে।

ও আচ্ছা , তাই বলুন, কানা জগলু! তা সে আবার সরকারী দলের নেতা কবে হলো?

স্যার, বোঝেন তো এদের অনেক গুলো খোলস থাকে, আবহাওয়া দেখে কেবল বদলে নেয়।

তা আপনার এত ভয় কেনো, ধরেছি তো আমি। না মানে ...

চুপ । আমি জানি কি করতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইলে করেন না করলে চুপ থাকেন। দেশের সরকার আর বড় বড় নেতারা বলে শোনেন না, সন্ত্রাসী আর অন্যায়কারীর কোন দল নেই। সুতরাং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

স্যার ওসব তো বলা কথা মাত্র। বাস্তবতা...

এদের অন্যায় সমূলে উৎপাটন হওয়া উচিৎ, সেটাও বাস্তবতা। যান, ব্যাটাকে এক্ষুনি নিয়ে আসুন।

জি স্যার।

শাহেদ টর্চার রুমের দিকে এগোতে এগোতে কিছুটা ভাবালু হয়ে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাত্র দুদিন আগের হাসপাতালের বেড। সেখানে স্পষ্ট সায়ানের মায়া মায়া মুখটা। নিথর পড়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। বড়াপু কাঁদছে পাশে বসে। সায়মা দৌড়াচ্ছে পরিচিত ডাক্তারদের কাছে।

ভাগ্নের সে অজ্ঞান চেহারার পাশ দিয়ে তার স্মৃতির কোটর হতে ভেসে ওঠে আরও একটি চেনা মুখ। মিষ্টি হাসিমাখা তৌফিক এর মুখটা স্মৃতি পটে পূর্ণ ভেসে ওঠার সাথে সাথেই সেটা একটা কংকালসার মুখে পরিণত হতে থাকে। মহাখালী আর গুলশানের মাঝামাঝি রাস্তায় পড়েছিল তৌফিক। যেভাবে রাস্তায় কুকর বিড়ালের পড়ে থাকে। অজ্ঞান। তখন রাত ১২টা। শাহেদ পিক আপে ফিরছিল বনানীর এক নামিদামী হোটেল থেকে ব্যর্থ অপারেশনের পর। ব্যর্থতা হবে জেনেও ছুটেছিল খবরটা পাওয়া মাত্র। ঐ হোটেলে দেশের এক খ্যাতনামা মডেল কে পাওয়া যাবে কোন এক বিদেশীর বাহু বন্ধনে, সাথে ইয়াবাহ জাতীয় কিছু-এমনই ইনফরমেশন ছিল। কিন্তু খবর লিক হয়ে যাওয়ায় সটকে পড়ে সময়মত। মাত্র ১০ মিনিট আগে পৌঁছালেই ধরতে পারত। ব্যর্থতার কষ্টটা নিয়ে থানার দিকে ফিরার পথেই চোখে পড়ে দেহটা। নিজেই গাড়ী থেকে নামে। চেহারাটা ঘুরিয়ে তাকাতেই চিনতে পারে। এই তো মাস পাঁচেক আগে একদিন দেখা হয়েছিল বসুন্ধরা সিটিতে। কলেজে পেরোনোর পর ওটাই প্রথম। পাশ দিয়ে এড়িয়ে যাবার উপায়ই ছিলনা। তৌফিক ওমনই। তারপর মোবাইল নম্বর বিনিময়। জেনেছিল ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করার পর সে একটি টেলিকম কোম্পানীতে জয়েন করেছে। ভাল পজিশন তার।

অথচ কি আশ্চর্য ক্লাশের সবচেয়ে ভদ্র ছেলেটা রাস্তায় পড়ে আছে এই গভীর রাতে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল শাহেদ। তৌফিকের পকেটে মোবাইল ছিল না, মানিব্যাগটাও ছিলনা। গাড়ীতে বসেই সে তৌফিকের নম্বরে ফোন দিয়েছিল। ওপাশ থেকে ফোন রিসিভও হয়েছিল।

আরে হারামীর পো, এত তাড়াতাড়ি হুস ফিরা পাইছস...

তারপর লাইন কেটে যায়। পরের দিন তৌফিক হাসপাতালে চিরতরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তৌফিকের অফিসে খোঁজ নিয়েছিল। ওরা জানিয়েছিল তৌফিকের নম্বর থেকে মোবাইল সেটের আইএমই নম্বর ট্রেস করার কি ব্যবস্থা নাকি আছে। সেই পদ্ধতিতে অপরাধীদের ধরা যাবে। কিন্তু বাস্তবে সে সবের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পারমিশন নিতে গিয়ে আর পাওয়া যায়নি। মোবাইল কোম্পানীর সহকর্মীরা দু'জন সাহায্য করতে চাইলেও পারমিশন ছাড়া কেউ পরে আর দিতে রাজী হয় নি, সবারই চাকুরী হারানোর ভয়। পরবর্তীতে তৌফিকের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধু অবশ্য খুব রিস্ক নিয়ে গোপনে শাহেদকে সাহায্য করেছিল। তৌফিকের নম্বর কোন মোবাইলে শেষবার ব্যবহার হয়েছে সেই মোবাইলের আইএমই নম্বর বের করে তার পর খুঁজেছিল সেই আইএমই নম্বরওয়ালা মোবাইলে এখন কোন সীম ব্যবহার হচ্ছে। সেই সীমের নম্বর এর সূত্র ধরে শাহেদ সেটটার ব্যবহারকারীকে খুঁজে পেয়েছিল ঠিকই তবে সেই ব্যবহারকারী সেটটা চোরাই মার্কেট থেকে কিনেছিল মাত্র দু'দিন আগেই। তার কাছে তথ্য আর কি পাওয়া যাবে?

তবে এই বিষয়টির আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে ডিপার্টমেন্টে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার জন্য তিরস্কারও শুনতে হয়েছিল।

ওদের খপ্পরে পড়ার সময় তৌফিকের কাছে একটা ল্যাপটপ ছিল। আর ছিল মানিব্যাগে হাজার দুয়েক টাকা। এত ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলের জীবনের মূল্য একটা ল্যাপটপ, একটা মোবাইল সেট আর দু হাজার টাকা। দারুন। এসব ভাবনা আসছিল আর অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের প্রতি তীব্র ঘৃণা অন্তরে ফুটছিল ফুটন্ত বাষ্পের মত।

ইনচার্জ কাদের এসে বলল, স্যার এই যে ব্যাটাকে নিয়ে এসেছি।

বসাও।

ব্যাটাকে অনেক কষ্টে ধরেছে। এবার একে দিয়েই এদের শিকড় অবধি পৌঁছাতেই হবে। যে করেই হোক। কিন্তু খুব সাবধান। চালে ভুল করা চলবে না। অথচ ভুল হয়েই যাবে সেটাও শাহেদ জানে। চারদিকে অজস্র জাল পাতা। তবুও একটা চেষ্টা করেই দেখা যাক। সেই চোরাই মার্কেটের সূত্র ধরে অনেক দূর তো সে গোপনে এগিয়েছেই, সে কারনেই তো সায়ানের মোবাইল চোরটাকে ধরা গেলো এত সহজে। আইডেন্টিফাই যখন হয়েছে, একে শাহেদ ছাড়ছেনা । মনে মনে প্রতিজ্ঞা তার আরও প্রবল হলো।

কনেষ্টেবল মোখলেছুরকে বলল অপরাধীর মাথার উপর ১০০০ পাওয়ারের বাল্বটা জেলে দিতে ।

কিন্তু স্যার একটা কথা না বলে পারছিনা, বেয়াদবী নেবেন না।

ভনিতা ছেড়ে কি বলবেন বলে ফেলেন কাদের।

রিমান্ডের অনুমোদন ছাড়া টর্চার করাটা কি...পরে জানাজানি হলে সমস্যা হবে না?

জানাজানি হলে! কে জানাবে, আমি না আপনি না এই মোখলেছুর।

না,ছি! তওবা তরবা! আস্তাগফিরুল্লাহ। স্যার আপনার মত মানুষ কে আমি কি বিপদে ফেলতে পারি, সিস্টেমের দোষে অনেক অন্যায় করি মেনে নেই তাই বলে অমানুষতো হয়ে যায়নি স্যার।

ওকে, আমিও আপনাকে বিশ্বাস করলাম। আর মোখলেছুর আমার কাছে কতটা বিশ্বস্ত তা আপনি ভালই জানেন। তা ব্যাটা কি তার নাম বলেছে এখনও?

জি স্যার, বলেছে একটা। আজগর আলী। আর স্যার জগলু ভাইও ঐ নামটাই বলছিলেন।

কি বললেন, জগলু ভাই! আবার ঐ ব্যাটার কথা। বাদ দেন না। ওমন ক্ষমতা সবাই দেখাতে চায়। ইচ্ছে করছে ঐ ব্যাটারেও ধরে নিয়ে আসি। দুঃখ হলো তারে ১০ মিনিটও আটকে রাখতে পারব না।

এটুকু বলে মনে মনে শাহেদ ভাবল কাদের কে স্বাক্ষী রাখা কি ঠিক হচ্ছে? আরে দূর কি হবে। এই আজগর না অজগর এমনেতেই পিছলে যাবে।

যতটুকু এর থেকে তথ্য নিয়ে এগিয়ে থাকা যায় সেটাই লাভ। যা হবে পরে দেখা যাবে।

এই তোর নাম কি?

শাহেদের প্রশ্ন শুনে মাথা তুলে তাকাল অজ্ঞান পার্টির সদস্যটি। চেহারা খুব একটা খারাপ না। অন্তত চোর বাটপার টাইপ তো নয়। ১০০০ পাওয়ারের বাল্বের নিচে তার উজ্জ্বল ফর্সা মুখটা ঝলমল করছে। সাথে ঘামের রেখা বাড়তে শুরু করেছে। কপালের ডান দিকে একটা লাল দাগ। ধরা পড়ার সময় কিছু উত্তম মধ্যম দিতে পেরেছিল শাহেদ, এটা তারই নিদর্শন। একটু ঘামতে শুরু করেছে। সায়ান ঠিকই বলেছিল, মোচটা বড় বেমানান। বাম পাশের ভগ্নাংশে জল জমতে শুরু করছে। শীত কালের শুকনো ক্ষেতের আইলে যেন প্রত্যুষের শিশির কণা।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গি খুব শান্ত, কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণ।

স্যার আমি কোন অন্যায় করিনি। আপনি ভুল করছেন।

অন্যায় করনি তো কানা জগলু তোমার জন্য ফোন করে কেনো?

আমি ওনার এলাকার বাসিন্দা। উনি এলাকার কমিশনারের সহকারী। ভালমন্দ দেখতে হয়, তাই করে থাকবেন হয়তো।

ও আচ্ছা। ভালভাবে জিজ্ঞেস করছি, বল, না হলে কিন্তু...

কি আশ্চর্য স্যার এটা কি বলছেন আমাকে মেরে ধরে মিথ্যে স্বাক্ষ্য নেবেন, এটা অন্যায় স্যার, আপনি একজন আইনের রক্ষক হয়ে সেটা পারেন না।

মাত্র একটা মোবাইলের জন্য ওই ভদ্র ছেলেটার শরীরে পয়জন ...

কে স্যার, আপনি কার কথা বলছেন , আমি বুঝতে পারছি না।

গত শনিবার সকালে বাসের পেছনে বসে ...মনে পড়েছে।

কি করে মনে পড়বে স্যার, আমি শনিবারে ঢাকাতেই ছিলাম না। আমার ঘরে বাসের টিকেট আছে। স্যার লাইটটা খুব কষ্ট দিচ্ছে একটু সরানো যায় না।

স্বীকার কর, আমাকে সাহায্য কর, তোমার দলের মূল শিকড়ের খবর দাও, কোন কষ্টই দেবো না।

স্যার আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। আমার পিছে সময় নষ্ট না করে মূল অপরাধীর সন্ধান করুন।

স্যার, হতেও তো পারে এই ব্যাটা সত্যিই কিছু জানে না।

চুপ কাদের। একদম চুপ। আই হারামীর পুত বলবি, না এইরকম ভং ধরে বসে থাকবি। পেছন দিয়া যখন বরফ ঢুকাই দিমু সব মুখ দিয়া বের হয়ে আসবে। শালা নিরহ একটা ছেলের শরীরে পয়জন ঢুকাতেও একটু মায়া লাগে না।

নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারল না শাহেদ। একটু সামনে এগিয়ে ব্যটার দুপায়ের মাঝে কষে লথি লাগাল। ব্যাথায় কুঁকড়ে উঠল অজগর।

স্যার মোখলেছুর কিন্তু পুরাটাই ভিডিও করছে। একটু খেয়াল করে।

অসুবিধা নেই, পরে কেটে নেবো।

এবার বল, সব স্বীকার করবি নাকি মার্ডার কেসের চার্জশীট ফাইনাল করেই কাল কোর্টে উঠাব। তোর জন্য আরও ভয়ের কথা আছে। সেদিন ঐ বাসের দু'জন স্বাক্ষী ও পেয়ে গেছি। ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন তো হবেই তোর।

সায়ান নামের ছেলেটাকে তুই নিজ হাতে খুন করেছিস।

জানিস হারামজাদা ঐ ছেলে আমাদের স্যারের ভাগ্নে।

চুপ থাকেন না কাদের। যা বলার আমিই তো বলছি।

ও আচ্ছা তাইলে স্যারের এত রাগ এই কারনেই ।

চুপ থাক হারামী। বল, তোর দলে আর কে কে আছে বল। ঐ দিন সাথে কে ছিল আর?

আমি তো বারবারই বলছি আমি কিচ্ছু জানি না। আপনি আমাকে কোর্টে উঠান। ওখানেই প্রমান হবে।

একটা খুন, ক্লিন খুন করার পরও তুই অস্বীকার করে যাচ্ছিস। আই মোখলেছুর ক্যামেরাটা কাদের এর হাতে দিয়ে বরফ নিয়ে আস।

অসম্ভব, খুন হইতেই পারে না। এর আগে আমি একশ'র বেশী বার ঐ সুই ফুটিয়েছি। কেউ মরে নি। মরতেই পারে না। ওটা বিশেষ ক্যামিক্যাল দিয়ে অনেক গবেষণা করে বানানো, অজ্ঞান করে দেবে ৮/৯ ঘন্টার জন্য, মরবে না। অন্য কোন কারনে মরেছে। আমার জন্য নয়। পোষ্ট মর্টেম করান নাই স্যার? আমি খুনী না। আপনি খুনের দায়ে ফাসাবেন না। বিপদে পড়ে যাব।

যাক স্বীকার তাইলে করলি হারামজাদা। এটাই চাচ্ছিলাম। ভালো করে ভিডিও করেছো তো এই অংশটা। এটুকু রাখলেই হবে। রিমান্ড কাল ঠেকায় কে। আর দরকার নেই ভিডিওর।

মোখলেছুর কে কথা কটা বলেই লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মেরে বসল শাহেদ অজগর মিয়ার মুখে। ঠোঁট কেটে গেলো। মাথাটা টেবিলে নামিয়ে আনল ব্যাটা। মুখ থুবড়েই পড়ে রইল।

মোখলেছুর ক্যামেরা বন্ধ করছ তো। রিমান্ডে নিলে বাকী কথা মুখ দিয়ে আপনাতেই আসতে থাকবে। যাও কিছু নাস্তা নিয়ে এস। এই ব্যাটার জন্যও এন। আর ক্যামেরাটা দাও। কারও হাতে পড়ার আগে কাটছাট করে নেই।

কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল শাহেদ। আর পেছনে কাদের আজগর মিয়ার কানে কানে বলল, সায়ান মরে নাই, ওটা স্যারের চালাকি ছিল। চিন্তা কইরেন না। কাল জামিন পাইয়া যাইবেন।

শাহেদ ক্যামেরা থেকে সদ্য ভিডিও করা ফাইল টা পিসিতে আপলোড করে নিল। দেখে নিতে লাগলো কতটুকু রাখা দরকার।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল শাহেদের রুম থেকে।

কাদের ফোন টা ধর। দেখতো এত রাতে আবার কে ফোন দিচ্ছে?

ফোনটা রিসিভ করেই কাদের ছুটে এল। স্যার, স্যার জগলু ভাই, থুড়ি হারামজাদা কানা জগলু ফোন দিছে। গালাগালি করতেছে স্যার। আপনাকে চায়।

শাহেদ উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল।

কি ব্যাপার বারবার ফোন দিচ্ছেন কেনো?

সালাম ছার। ভালা আচেন। চিনবার পারতাচেন তাইলে। শরীরটা ভালা সাবের।

কি হয়েছে বলুন?

না এ হইলো গিয়া ছার, ঐ আজগর মিয়া হামাগো মহল্লার বাছিন্দাতো। খাইট্যা খায়। এই টুকটাক ব্যবসা আচে বুঝলেন না। এরে ধইরা আনছেন কেন বুঝবার পারতাচিনা ? আপনার কোন ভুল হইয়ার পারে। আইচ্ছা ঠিক, ধরছেন ধরছেন ভালা করচেন। না ছাড়েন না ছাড়েন , কাইল কুটে উঠায় দিয়েন, জামিন নিয়া নিমুনে। ঠিক আছে না ছার।

কি করছে, তাই না? কালকের টা কাল বুঝবেন।

ছার চ্যালেঞ্জ কইরেন না। চ্যালেঞ্জ কইরেন না। আপনি মামুলি অফিসার। আমরা আপনাগোর নেতা। আপনাগোরে আমরা চালাই।

চুপ। অনেক রাত হয়েছে। কাল কোর্টে যা বলার বলেন। রাখেন।

ঠাস করে ফোন টা রেখে দিলো শাহেদ। রাগে ফুসছে। শালার এই হলো চাকুরী। জানে ঐ লোকটা চার পাঁচটা খুনের আসামী। কিন্তু এর সাথেই ভদ্র ভাবে কথা বলতে হয়।

শাহেদ ফোন রেখে কম্পিউটারের সামনে যখন ফিরে আসছে। একটু আগেই পিসির চেয়ার থেকে উঠে গেছে কাদের। এবং পেনড্রাইভটা খুলে নিতেও তার একটু ভুল হয়নি।

আজগর আলীকে পরদিন সকালেই কোর্টে চালান করা হলো।

কানা জগলুর চেষ্টা কাজে লাগলো না। শাহেদের গতরাতের ভিডিও ক্লিপের বিশেষাংশ তাদের সব চেষ্টার মধ্যে আগুনে জল ঢেলে দিলো। স্পষ্ট দেখল সবাই আজগর আলীর সুস্থ কণ্ঠে সুন্দর সাবলীল স্বীকারোক্তি। একশ জনের বেশী মানুষকে অজ্ঞান করার কথা শুনে কে না তাজ্জব হবে। তিনদিনের রিমান্ড পেতে তাই শাহেদের খুব একটা বেগ পেতে হলো না।

কোর্ট থেকে বের করে যখন ভ্যানে উঠানোর জন্য নেয়া হচ্ছিল আজগরকে সেই ফাঁকে কানা জগলু কাদেরকে কাছে ডাকল। পুরো রাগটা কাদেরের উপর দিয়ে চালিয়ে নিজেক শান্ত করার চেষ্ট চালালো ঐ নব্য স্থানীয় নেতা। তবে খুব উচ্চবাক্য করতে পারল না। পাছে আবার শাহেদ এর কানে চলে না যায়।

কাদের কাচুমাচু করে মোটামুটি হাতটা জড়ো করার মত করেই বলল, জগলু ভাই, পেনড্রাইভটা খুঁজে পাচ্ছি না। ভাববেন না, তিনদিনের রিমান্ড তো, আমি দেখব খেয়াল রাখব। ঐ পিসিতে আমি একটা বাড়তি কপি রেখেছি। কালকেই আমি পাঠাচ্ছি। শাহেদ স্যার এবার ঠান্ডা হয়েই যাবে। খুব ভোগাচ্ছে। না খেয়ে মারা যাবার মত অবস্থা বস।

ওক্কে দেখা যাইব। এই নে পাঁচশ টাকা। কোন কথা স্বীকার করলে তোমার খবর আছে কইলাম বাবধন। আর ভাই কি রে? ভাই কস কেলা? আর ভাই নাই, এখন আমি স্যার হৈছি রে। দল খেমতায় , বুঝবার পারস না। পালে লাগছে হাওয়ারে, হাওয়া, উদাস হাওয়া, খালি পালটা ধইরা রাখবার পারলেই হইবো। তুই ও পাল লাগা একখান।

শাহেদ এর মাথাটা একটু ঠান্ডা এখন। এই লড়াইয়ে এটা তার প্রথম জয়। আজগর মিয়া এখন আর তার মূল টার্গেট নয়। শিকড় সন্ধানী এখন সে। শিকড়ের খোঁজ এই ব্যাটার কাছ থেকে যে করে হোক তাকে বের করতেই হবে।

মোবাইল টা বেজে উঠল শাহেদের। সায়ানের মার ফোন।

হ্যালো , আপা কিরে?

মা এসেছে।

কখন? এই তো সকালে। সায়ান এর ঐ বিপদের খবরে খুব চিন্তায় ছিল। নিজ চোখে ওকে সুস্থ দেখে তবে মার শান্তি হয়েছে।

তা তো হবেই রে আপা, প্রায়ই পত্রিকার পাতায় যেভাবে খবর বের হচ্ছে। অজ্ঞান পার্টির কবলে আজ এ মারা যাচ্ছে তো কাল সে।

বাসায় আসছিস কখন?

আপা, ভাল খবর আছে। আজগর মিয়া , ওহ নাম তুমি জানবে কি করে। ঐ যে যে হারামজাদাটা সায়ানকে অজ্ঞান করে মোবাইল ছিনতাই করেছিল, তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে আজ। আজ রাতেই আমি প্রথম এ্যাকশন শুরু করব।

ওমা! এ দিকে আমরা রুমকীদের বাসায় যাব বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। রুমকীর মা বাকেও বলা হয়েগেছে। এখন তুই না এলে ...

মা তো মাত্র এল। আজকেই কেনো?

না দেরী করে কি লাভ। রুমকীও একটু ফ্রি আছে। আজকেই পাকা কথাটি শেষ করা দরকার। এমনেতে সবাই তো রাজী। সায়মার কাছে রুমকী বলেছে, ওর আপত্তি নেই। তোকে জানানো হয়নি। তারপরও আজ দু'জনে কথা বলে ক্লিয়ার হয়ে নিস। আমরা দেরী করতে চাচ্ছি না। ওরাও তাই। এদিক মা অসুস্থ, জীবনের আর কয়দিনেরই ভরসা, বল। বিকেলে ঘন্টাখানেকের জন্য আসতে পারবিনা?

ঠিক আছে? তোমরা রেডি হয়ে থেকো। আমি সময় মত চলে আসব। কিন্তু এক ঘন্টা কিন্তু মাত্র।

বিকেলে আজ তুমিও আসছ তো সায়ান?

আবার জিগায়। তোমারে দেখার কোন সুযোগ কি মিস করা যায়গো সোনামণি।

খুব যে আদর এর ডাক ডাকছ। শরীরে পয়জান কি এখনও ঘুরঘুর করছে নাকি। এত সোহাগী কথা কণ্ঠে?

শিমকী, কাল একটু মাথা ঘুরাচ্ছিল ঠিকই। মাকে বলিনি। অযথা টেনশন করবে , ঠিক করেছি না।

না ঠিক করনিগো। ওষুধ খাচ্ছ না? আবার মাথা ঘুরালে মাকে অবশ্যই বলবে। বলবা তো?

তোমাকে বললে হবে না। তুমি উপদেশ দেয়াতে কম যাও কিসে।

আচ্ছা রুমকী আপু শাহেদ মামাকে না মামা বলে ডাকে!

হুঁ, আজ থেকে আর ডাকবে না। খুব ভালো হচ্ছে। বিয়েটা কালই হয়ে গেলে আমি খুশি হতাম। যখন ইচ্ছে তোমার বাসায় আমি আর আমার বাসায় তুমি আসতে পারতে।

ভাল হতো না ছাই। একবারও চিন্তা করেছো, আমার আপুকে তোমার মামী বলে ডাকতে হবে।

হবে।

বাহ! সোনার চান আমি তাইলে তোমার কি হব তখন?

যা আছ। আমার প্রেমিকা ।

ঘোড়ার ডিম, মামীর বোন খালা হয় গো!

আরে, তাইতো। চল তাইলে বিয়েটা ভেঙে দেই।

কেনো, খালা সম্পর্ক হলে বিয়ে করবানা?

কেনো করবোনা, প্রেম কি করেছি খেলা করতে নাকি!

হতেও পারে। ধীরে ধীরে তুমি যেমন আড্ডা বাজ আর বাউন্ডুলে হতে চলেছ, প্রেমটাই কখন খেলা বানিয়ে ফেল আর নারীদেও বানাবে হাতের পুতুল। ছেলেরাতো ওমনই হয়, আমি জানি।

অবিশ্বাসী মানুষের সাথে তোমার মত বুদ্ধিমতি মেয়ের তো প্রেম করার কথা না। করছ কেনো?

দারুন কথা শিখেছ।

আই মামা বাসায় এসে গেছে। রাখি। শোন , তুমি কিন্তু নীল রঙের শাড়ী টা পড়বে।

নাহ! শাড়ী পড়া যাবে না।

আমি জানি না। রাখছি।

কিরে তোর শরীর কেমন। আর কোন সমস্যা হয় নিতো?

ভাল মামা।

সায়মা কই রে। ডাক তো।

আপু, ওআপু, ছোট মামা ডাকছে।

সায়মা, কেমন আছিস?

ভাল, মামা। খুব খুশি খুশি লাগছে যে।

হুম অজ্ঞান পার্টির শিকড়ের সন্ধান পেতে যাচ্ছি তো ।

ইস্ ! খালি কাজের ঢং। বলল একটা আরকি। রুমকীর কথা ভেবেই এত খুশী। ওর মত মেয়েই হয় না।

আচ্ছা সত্যি তো , রুমকী নিজে থেকে রাজী? তোকে বলেছে?

হ্যাঁ, মামা, হ্যাঁ। কিন্তু রুমকী খুব চিন্তিত। তোমাকে মামা বলে ডাকে তো, খুব লজ্জার মধ্যে আছে। কেমন হলো না বিষয়টা?

সে সময় বলে দেবে। এখন রেডি সবাই, চল। আপা কই।

ঐ তো মা আসছে।

মা কেমন আছে আপু। ঘুমাচ্ছে। শরীরটা ভালো না।

মা যাবে না?

উনার যাওয়ার দরকার আছে নাকি? তোর দুলাভাই আছে, উনিইতো গার্জিয়ান, ঠিক আছে।

বড় ভাইয়াকে বলার দরকার ছিলনা?

ফোন দিয়েছিলাম। ভাইয়ার গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। সামনে বাজেট না। অর্থ মন্ত্রনালয়ের মত বিভাগের একজন যুগ্ম সচীবের সময় আছে নাকি আসার। আর সবাইতো জানেই সব। জাস্ট একটা ফরমালিটি। তোর দুলাভাই যা সিদ্ধান্ত নেবে বড় ভাইয়া বলেছে তাই মেনে নেবে।

স্লামালাইকুম দুলাভাই।

এই যে শালা বাবু খুব তো হাসি খুশী। শুনলাম আজগর আলীর তিন দিনের রিমান্ড মিলেছে। ছেড়ো না মোটেও। সুযোগ সব সময় আসে না।

দুই হাতে মোট ১০টা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সায়ান সবার আগে শিমকীদের দরজায়। সিঁড়িতে উঠার সময় মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। বুঝতে পারে ভেতরে একটা হালকা দূর্বলতা রয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু কাউকে তো বুঝতে দেয়া যাবে না। দরজাটা খুলল শিকমী। লাল রঙের একটা ঘাগড়া জাতীয় কোন ভারতীয় নায়ক নায়িকার নামে নামকরনকৃত ড্রেস পরনে। আনারকলি, নুরজাহান, পার্বতী বা কাশিশ এইসব কিছূ একটা হবে, এতটুকু সায়ান জানে। মেজাজটা চরম বিগড়ে গেলো সায়ানের। মুখটা একটু বাঁকিয়ে সে মনোভাবটা প্রকাশও করল শিমকীর জন্য।

সবাই আসন নেয়ার পর শিমকীর সাথে দু'মিনিট আড়াল পাওয়া গেলো। বলেই ফেলল সে সুযোগে, শুনলে না কথাটা।

আরে না, কি বলে! দেখতে এসেছো আপুকে আমি এত সাজব কেনো? নিয়ম কানুন কিছু জানে না, খালি ফোঁসফোঁস করে।

সাজ নি, বল সেজেছি তবে আমার মনের ইচ্ছাটাকে মেরেই তবে।

হুঁ , এই যদি সাজ হয়!

সাজ না তো এটা কি? এই জবর জং ড্রেস...

হয়েছে, কিছু না পড়লেই বরং খুশি হতে বেশী , তাই না।

না মোটেও না, তাতে সৌন্দর্য খুঁজে নিতে খুব অসুবিধা হতো।

আই শিমকী যা তুই আর সায়ান ও ঘর থেকে রুমকীকে নিয়ে আয়...মা'র কথায় আর খুনশুটি এগোলো না।

রুমকীকে অসাধারণ লাগছে। সাদামাটা সাজেই ওকে ভাল মানায়। শাহেদ তো একবার তাকিয়েই মনে মনে ভাবল সেই ছোট বেলায় পড়া লাইনদুটো, আমি পাইলাম আমি পাইলাম... ।

সায়ানের বাবা আর রুমকীর বাবা মোটামুটি একমত হলেন। এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার বিয়ে। সময় হাতে খুবই কম, মাত্র দশদিন। দেরী করে কি লাভ। শাহেদের মাও এই আছে এই নেই অবস্থা। উনি ছোট ছেলের বউ দেখে যেতে চান।

সায়মার বাবা বললেন, ভাইসাব ঘরোয়া পরিবেশেই বিয়েটা হয়ে যাক। পরে বড় করে অনুষ্ঠান করা যাবে।

ভুল বললেন, আমরা কিন্তু আর ভাই থাকলাম না।

তা ঠিক, তবে শাহেদ আমার ছেলের মতই তো।

মুরুব্বীদের এই আলোচনার সময় রুমকী আর শাহেদকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। স্থান নির্ধারণ করা হলো রুমকীর ঘরে। কথাতো

আগেই কত বলেছে। এবার কেবল মামা ভাগ্নির সম্পর্কটার কুরবানী আর কবরের সূচনা করাই উদ্দেশ্য ।

দশ

মানাতাম। অন্তত দেখতে আমি কি করি। সময়টা দিতে হবে তো। বললাম কেবল, শোন এইভাবে বিয়ে না করে সবাইকে বলি...তুমি তো রাগ করে বিয়ে করার গো ধরেই বসলে। কোন কথাই শুনলে না। কেউ মানতো না আবার...

বাদ দাও না রেশাদ, ওসব মনে করে কি হবে। আমার পেটে তিনমাসের একটা আগন্তুক। এটাই আমার বর্তমান। তুমি তো কোন ভুল করনি, তাই না; তাহলে কোন কষ্ট মনে রেখোনা। আমাকে ভুলে যাও। আমার নিয়তির হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যাও।

কিন্তু আমি জানি। সব শুনেছি, বুঝেছি। আর নাই বুঝি রুমকী তো আমাকে না বলে থাকবে না, কোন দিন না। ও বলে, সব বলে। বলে তোমার যন্ত্রনার কথা, নিরব কষ্টগুলো একটু একটু করে।

কি জেনেছ? রুমকী কি আর জানে? আমাকেই জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতাম। আমার স্বামীর বদমেজাজ। রাতে নেশা করে বাড়ী ফেরা। আর কালে ভদ্রে ...এই সবই তো।

কালে ভদ্রে কি বলতে চাইলে, শেষ কর।

না আর জেনে কি করবা। এসবই অদৃষ্ট।

আমি ওত কিছু বুঝি না। তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে বাসি । যা ভুল হয়েছে হয়েছে এবার আর ভুল না। সব ছেড়ে চলে এস।

কে বলল আমি তোমাকে ভালবাসি। সে তো অতীত। বাসতাম আর বাসিকে এক করে ফেলছ কেনো?

চল বলেই সৃজয়ার হাতদুটো মুঠোয় ধরে নিজের পানে টান দিয়েছিল রেশাদ। সেই টানে একটু ঝুকে এসেছিল ওর খুব কাছে ।

কপালের ফের। ঠিক তখনই ঘরে ঢোকেন সৃজয়ার স্বামী পুরষটি। সৃজয়ার বাবা মার পছন্দের অতি অসাধারণ পাত্র।

এই প্রথম রেশাদ দেখল লোকটিকে। লম্বা, শ্যামলা বর্ণের চেহারায় রুক্ষতার কোন অভাবই নেই। মায়া ওমন চেহরায় কোন কুক্ষণেও স্থান পেতে পারে না। যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল রেশাদের চোখ দুটো।

লোকটা সৃজয়ার নাম ধরে চিৎকার দেয়ার আগেই সৃজয়ার হাতদুটো আপনাতেই ছেড়ে দিয়েছিল রেশাদের হাতের বন্ধন।

সৃজয়ার মুক্ত একটা হাত বাম হাতে টেনে ধরে লোকটা কোন কথা নেই ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ওর গালে।

ছিঃ সৃজতা, নিলর্জ্জ বেহায়া ইতর, ছোট লোকের মেয়ে। কে কে এই লোক? নিশ্চয় রেশাদ। যা শুনেছিলাম।

রেশাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল।

লোকটা খুব মিষ্টি করে বলতে চাইল, ইউ মে গো। যদিও কথাটা মিষ্টি হলো না মোটেও।

তারপর আবার সৃজতার দিকে ফিরে, যা সন্দেহ করেছিলাম, পেটের বাচ্চাটাও তাইলে ওই ব্যাটার...

দেখেন মিঃ আপনি অযথা সন্দেহ করছেন। রেশাদ কথাটা বলার সাথে সাথে সৃজয়াও বলে উঠল, তুমি এমন করছ কেনো? এ বাচ্চা তোমারই। রেশাদ ভাইয়ের সাথে আমার ...

থামিয়ে দিয়ে ...আপনি এখনও যান নাই, বের হন। বের হন এক্ষুনি।

সৃজয়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিরবে অনেক কিছু বলার মত করে চাইল। সৃজয়া মাথা নিচু করে চোখের জল মেঝেতে পতনের অপেক্ষায়। রেশাদ বেরিয়ে এল।

বাইরে এসেই কান্নার আর বাঁধ মানতে চাইল না। এত কষ্ট সৃজয়ার। তার প্রাণ প্রিয় সৃজয়ার। সব তার জন্য। এই কষ্ট কেমন করে মানবে তার মন, কেমন করে, সে বুঝে উঠতে পারে না।

বাসায় গিয়ে রুমকীর মোবাইল দিয়ে ফোন করল সৃজয়ার নম্বরে। বন্ধ। খুব অস্থির লাগছিল রেশাদের। বুঝতেই পারছিল না সেদিন তার কি করা উচিৎ। উল্টোপাল্টা লাগছিল চারপাশ। রাগ হচ্ছিল ভীষন নিজের উপর, অত বোঝাবুঝির কি ছিল, ধুপ করে বিয়ে করে ফেললেও পারত। ঠেকাতেও তো পারত বিয়েটা । তাও কেনো করল না। অসহ্য যন্ত্র না নিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিল রেশাদ।

সন্ধ্যায় বাসায় এলেন সৃজয়ার মা বাবা। সৃজয়ার বাবা সম্পর্কে রেশাদের মামার শালা হন। আত্মীয়ার সম্পর্কটা বজায় ছিল। সোজা এসে তাই রেশাদের বাবার সাথে রাগ ঢাক না করেই বলতে লাগল আজেবাজে কথা যা তাদের বিশ্বাস।

রেশাদকে সাবধান করে দিন ভাই সাব। এসব কি। ভ্রদ্র ঘরের ছেলে হয়ে, তাও আপনার মত একজন সম্মানী লোকের ছেলে হয়ে, ছিঃ ছিঃ।

কি করেছে আমার ছেলে?

কি করেছে মানে আপা, কি করেনি তাই বলেন। ওমন ছেলেকে বাড়িতে রাখাও যে পাপ। কখন দেখবেন কাজের মেয়েরেও ছাড়বে না। ছিঃ ছিঃ, এসব কেলেংকারি কই লুকাই আমরা। কি করে বলি আপা? ছিঃ সৃজয়ার পেটের সন্তানটা রেশাদের পাপের ফসল। আমার মেয়েকে ওরা এখনও যে ছেড়ে দেয়নি তাইতো অনেক। কেবল অ্যাবরশন করানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। লোক জানাজানি হলে কি হবে চিন্তা করেছেন ।

এমন ছেলেকে কেউ পেটে ধরে। আমার হলে কেটে টুকরো করে ফেলতাম।

রেশাদ শুনছিল , পাশের ঘর থেকে। রুমকিও ছিল পাশে।

ভাইয়া!

নারে লক্ষ্মী বোন , তোর ভাইয়া এতটা অপদার্থ নয় রে। বিশ্বাস কর।

আমি জানি ভাইয়া। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলে কি হবে। ওখানে গিয়ে প্রোটেষ্ট কর।

প্রোটেস্ট করেছিল। বিশ্বাস করানো যায় নি রাগের কাছে বশিভূত মুরব্বীদের। সৃজয়া নিজে স্বীকার করেছে। তার মা তাইই বলল। তারপর তো আর কথা থাকে না।

উহ! নো। রেশাদের মাথায় তার একরোখা রাগটা চড়ে গিয়েছিল। আর কিছু বলে নি। বাবাও রাগে যা তা বলা শুরু করলেন। বাড়ী থেকে বললেন বের হয়ে যেতে।

সোজা বের হয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। তারপর আর ও বাড়ী যাওয়া হয়নি তার। রুমকীর সাথে যোগাযোগটা রেখেছিল কেবল। রুমকীকে রেশাদ বলেছিল সৃজয়াকে বোঝাতে, যেমন করে হোক অ্যাবরশনটা ঠেকাতে। বাচ্চাটার কি দোষ?

রুমকীকে এরপর কোনদিনই বলতে দেয়নি সৃজয়ার কোন কথা। শুনতে চায়নি। জানলেই মনের আপন খেলায় মন মাতোয়ারা আর কষ্ট যাতনা শুরু করে দিত। কি দরকার।

এসব কথা আজকাল খুব একটা ভাবে না রেশাদ। খুব অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার পাহাড়ী একাকীত্বে। আজ মনটা কেমন যেন বিষন্ন লাগছে। হয়তো আবাহাওয়ার কারনেই। বহিঃবিশ্বের সাথে সংযোগের একমাত্র উপাদান রেডিওটা বহুদিন পরে অন করেছিল আবহাওয়ার সংবাদ শোনার জন্যই। সে জানলে অন্যরা এখানের জানতে পারবে। সেটাই কম কিসে। বেবি মেয়েটা তার জন্য খাবার দিয়ে চলে গেছে ঘন্টা খানেক আগে। চারদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে বাতাসের শো শো আওয়াজ গমগম করে বাজছে। রেডিওটা অনেক কষ্টে ধরা গেলো । সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বিশেষ করে কক্সবাজার, টেকনাফে ৮ নম্বর বিপদ সংকেত দেয়া হচ্ছে। যে ঝড়টা এগিয়ে আসছে তার নামটা শুনে কোন ভয় জাগানো কিছু মনে হলো না। নামটা আইরিন। ঝড়ের নাম এমন মানায় না।

অনেকদিন পরে মার জন্য রেশাদের মনটা আকুল হয়েছে। মা ভীষন ভয় পান ঝড়ের প্রলয় শব্দে। ঢাকার ইট পাথরে এই ঝড়ের মাত্রা দুর্বল, তবুও তার মা ওতেই কাবু হবে সে জানে। মনে পড়ে একবার এমন এক ঝড়ের দিন,

সেটা ৯৮ সালে। সারদিনই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। জিদ ধরেছিল সৃজতা ঐ বৃষ্টিতেই ঘুরতে যাবে। কিন্তু তখন কি বুঝেছিল সন্ধ্যার পরে ঝড়টা ভয়াবহ রূপ নেবে। সৃজয়াকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে ঝড়ের মধ্যে পড়েই গেলো। একদিকে বাতাসের তোড় অন্যদিকে পানির ঝাঁপটা, খুব কষ্ট হয়েছিল। বাসায় ফিরে মাকে পেয়েছিল অজ্ঞান। এত ভালবাসে যে মা আজ তার কোন অস্তিত্বই নেই জীবনে। তবুও মনে তো পড়বেই। মার অস্তিত্ব কি আদৌ ম্লান হতে পারে?

রেশাদ পাহাড়ের এই নির্জনতায় আবাসন গড়ার পর টুকটাক অনেক ঝড় দেখেছে। তবে এবার তার কাছে সাধারণ কোন ঝড় মনে হচেছ না মোটেও। পাহাড়ের অধিবাসীদের সাবধান করাটা তার নৈতিক দায়িত্ব মনে হলো। স্কুল ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল। চারদিকে থেকেই শো শো করে বাতাস ছুটে আসছে। একটু দূরে পেছনে রুমা বাজারের দিকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প হতে মাইকে সতর্কবাণী শোনানো হচ্ছে। সকল কে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে অবস্থান নেয়ার জন্য বলছে তারা।

রেশাদ কিছুটা স্বস্তি নিয়ে আর স্কুলে গেলো না। ঘরে ফিরে এলো। এই ঝড়ো বাতাসে স্কুলে যাবার জন্য যে পাহাড়টা পেরোতে হয় তাতে চড়ার মত অতটা অভিজ্ঞ পাহাড়ি সে এখনও হয়ে ওঠেনি। সমতলের অভিজ্ঞতায় ভরপুর মনটা পুরো বদলানো যায় না। সৃজয়া বদলাতে দেয়না। সারাক্ষণ হেঁটে চলে মনের ভেতরে যত্রতত্র, হেঁটে চলছে এই ঝড়ো রাতেও।

ঘরের জানালাটা প্রচন্ড বাতাসে একটু পর পরই দরাম করে বন্ধ হচ্ছে আবার খুলছে। বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ক্রমাগত হচ্ছেই। সে সেই ভোর বেলা থেকেই। রেশাদের মা সেদিকে তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে। জানালাটা বন্ধ করতে হবে খেয়াল নেই। এত ভয় তার ঝড়ে অথচ মনটা পুরো রেশাদের চিন্তায় ডুবে আছে। কে বুঝবে তার মনের এই নিরব ভয়কর ঝড়ের বিষয়। কেউ না। সবার কাছে যে দোষী তার ছেলে। ছেলেটা শুনেছে পাহাড়ে থাকে। একটু আগে টিভিতে শুনেছেন তিনি ৯ ডিগ্রি বিপদ সংকেত। খুব চিন্তা হচ্ছে। রুমকী রুমকী বলে কয়েকবার ডাকলেন।

রুমকী মার ঘরের দিকেই আসছিল। বাবা দেখতে বলছিলেন কোন জানালাটা খোলা ? মার ডাক শুনে দ্রুত দৌড়ে গেলো রুমকী।

কি মা, জানালা বন্ধ করছ না কেনো? ভয় করছে খুব?

তোর বাবা কি করছে, আর শিমকী?

ওরা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত।

আজ রেশাদ থাকলে সব ঐ করত। কত আনন্দে মেতে থাকত। তোর বাবাকে একটুও কষ্ট করতে দিতনা কখনও। আমি জানি তোর সাথে ওর যোগাযোগ আছে। বিয়ের কথা জানিয়েছিস্?

জানিয়েছি মা, রাগ করো না, তোমাদের না বলেই আমি ফোন দিয়েছিলাম। ভাইয়া যেখানে থাকে সেই রুমা বাজারে তো মোবাইল নেই। বান্দরবান শহরে ওনার পরিচিত একজনের নম্বর দিয়েছে ভাইয়া আমাকে। ওনাকে বলে দিলে খবর ভাইয়াকে পৌঁছে দেয়। কাল বিকেলে ফোন দিয়েছিলাম। আজ তো ভাইয়া জেনে যাবার কথা।

আরে পাগলি, ওর উপর কি আর রাগ আছে এতদিন। কিন্তু রেশাদ যে খুব অভিমানী ছেলে।

মা, ভাইয়া কিন্তু সত্যি নির্দোষ...

জানি রে, মা হয়ে সেটা আমি বুঝবনা ,তা হয় না।

তাহলে?

থাক না, তার কাছে ঐ দুনিয়া যদি ভাল লেগে থাকুক, সে সুখী হোক। ও সাধারণ দশটা মানুষের মত মোটেও নয়। ওর জন্য নিয়ম আলাদাই। ওকে বলিস বিয়েতে আসতে, তুই বললে নিশ্চয়ই আসবে।

বলব, মা । জানালাটা বন্ধ করে দেব?

দে।

একটু চা বানাই, খাবে?

না এই অবস্থায় চুলার পাশে যাওয়া লাগবে না।

মা, দূর ভয় পেও না। কিচ্ছু হবে না। বাবা চাইলো তো।

একটু আমার পাশে বস না মা। বলতো সত্যি তুই এই বিয়ে নিয়ে তোর কোন অমত টমত নেই তো। তুই খুশি তো?

মা আমি একজন ডাক্তার, নিজের কথা বলার মত সাহস মনে আছে। আমার অনিচ্ছা থাকলে তো বলতামই। গ্রাম্য তরুণীর মত মুখ বুঝে ইচ্ছের জলাঞ্জলি নিশ্চয় দিতাম না। শাহেদ মামা, থুড়ি , শাহেদ কে তো আমি সেই বহুদিন ধরেই সায়মাদের বাসায় দেখছি , চিনেছি। পুলিশ অফিসার হলে কি হবে উনি সত্যিই মাটির মানুষ। খুব ভালো মানুষ। যাই মা, ঐ যে বাবা ডাকছে। চা বানিয়ে দেই।

মামা বলে ফেলায় হঠাৎ লজ্জায় ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল। লজ্জা থেকেই যেন দৌড়ে পালালো, মার চোখ অবশ্য এড়াই নি। মুখ টিপে

হাসলেন। প্রচন্ড শব্দে কোথাও ধারে কাছে একটা বাজ পড়ল। রেশাদের কথা চিন্তা করে তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুঁফোটা জল ।

মা শিমকী। বিয়েটা আরেকটু পিছিয়ে দিলেই ভাল হতো নাকি, বলতো?

ছোটদের কথাতো শোন না। এখন কেনো। আমি তো বলেই ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি হবে না। আপুর বিয়ে অনেক ধুমধাম করতে হবে।

ধুমধাম হবে তো। ছাদের উপর বড় প্যান্ডেল করা হবে। আলোক সজ্জা হবে। ঘরোয়া হলেও নিকটআত্মীয় সবাইকেই বলব। সায়মার নানী তো অসুস্থ মানুষ। তার ইচ্ছাটারও তো একটা মূল্য দিতে হয় , তাই না মা।

কিন্তু বাবা এই ঝড় কবে থামবে। কাল থেকে সব আয়োজন শুরু না করলে কি আর শেষ হবে? আর শোনো ছাদ টাট বাদ দাও, হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

বিপদসংকেত যেভাবে দুমদাম করে বাড়ছে ঠিকই এই আইরিন ঝড় আজ রাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে দেখিস। কিন্তু তোর বুদ্ধিটাতো খুব ভালো রে। ভালোই বলেছিস। দেখি কাল স্কুল কমিটির সবাইকে বলে। এখন আয় কাকে কাকে বলতে হবে লিস্টা শেষ করে ফেলি।

বাবা তুমি লিখতে থাক। আমি একটু রুম থেকে আসি। আর আমার বুদ্ধি না, ওটা যার বিয়ে তারই ইচ্ছে ।

তাড়াতাড়ি আসিস।

নিজের ঘরে ঢুকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বইছে এখন। বরান্দার দরজাটা খুলে সাথে সাথে টেনে দিল। গম্ভীর গুরু গর্জন বাতাসের প্রবাহে। সায়ান কে কল দিল। এনগেজ। দ্বিতীয়বারও দিল তাও এনগেজ। খুব রাগ হলো শিমকীর ।

তৃতীয়বারের বার কল রিসিভ করল। ফোনের ভেতর বাতাসের শো শো শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কি ফোন ধর না কেনো? কার সাথে এত ইটিশপিটিশ?

মার সাথে কথা বলছিলাম। মা খুব টেনশন করছে।

মানে, তুমি কোথায়? বাইরে!

হুঁ।

কেনো বাইরে? তোমাকে না সকালে বললাম আইরিন আসছে। বাইরে যেতে মানা করলাম।

উহ, শিমকী এত খরদারী করছ কেনো। এমন করে বলছ যেনো আইরিন তোমার ঘনিষ্ট কোন বান্ধবী। দুপুরে বড় মামার বাসার গিয়েছিলাম। মা একটা কাজে পাঠিয়েছিল। ওখান থেকে বের হয়ে মামার বাসার কাছেই এক বন্ধু

বাসায় ঢুকেছিলাম। তারপর তো বৃষ্টিতে আটকে গেলাম। এত জোড়ে বাতাস বইছে দেখতো হাঁটাই যাচ্ছে না।

এত কিছু বুঝি না। ২৫ মিনিট পর ফোন দেবো? বাসায় না থাকলে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে খুঁজতে বের হয়ে যাব। একটু পরে ঝড় আরও বাড়বে । দ্রুত। দ্রুত হাঁট। তুমি তো জান আমি কত এক রোখা। মনে থাকবে তো। ফোন রাখছি। ও শোন , কিভাবে আসছ? সাবধানে এস, দ্রুত করতে গিয়ে আবার ইয়ে করে বসো না। হেঁটেই আস। রিকশা উল্টে যাবে কিন্তু। আসতে আসতে একটা কথা ভাববা-ঝড়গুলোর নাম এত সুন্দর আর মেয়েলী নামে কেনো রাখা হয়? এইটা তোমার নতুন অ্যাসাইনমেন্ট।

একটু ভয় ভয় লাগছে সায়ানের। মাত্র ক'দিন আগের ঐরকম একটা সমস্যা থেকে উঠল। যে ভাবে কাঁপছে আবার না জ্বর চলে আসে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিটুকু খারাপ লাগছিল না। কিন্তু হঠাৎই বেড়ে গেলো বাতাসের গতিবেগ। বাড়ছে তো বাড়ছেই। এখন কি করে? হেঁটে সামনে আর এগোনো যায় না। বন্ধুর মা একটা ছাতা দিয়েছিলেন সেটাও আনলে পারত। লাভ যদিও হতো না। এই বাতাসে ছাতার মাথা উল্টে ভেতরে ঢুকে যেত আগেই। দু একটা লোক দেখা যাচ্ছে। বাড়ী ফেরা চেষ্টায় বাতাসের সাথে যুদ্ধ করছে বিশাল ঝড়ে বেমানান সে গুটিকয়েক মানুষ।

যাক এই তো আর একটু। সামনেই দেখা যাচ্ছে ধ্যানার মাজারের উঁচু মিনারটা। মিনারের উপর এক ফালি চাঁদের উপর একটি তারা। সেখানে পানির ফোঁটায় আলো পড়ে ঝলমল করছে। হঠাৎ সায়ানের মনে হলো মিনারের উপর পূর্ণ চাঁদ কেনো বানানো হয় না? কি জানি? শিমকীর মাথায় এই টা ঢুকাতে হবে। কিন্তু দেখা যাবে উল্টো সেটা তার জন্যই নতুন অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে দাঁড়াবে। তবে ঝড়ের নাম কেনো মেয়েদের নামে হয় সেটা আসলেই ভাবার বিষয়। দুর শিমকী নিজেই তো এক ঝড়। তবুও তো ওকে হঠাৎ ক'দিনে কি ভীষন ভালবেসে ফেলেছে। না হঠাৎ মনে একটা প্রচন্ড খুশির ঝড় অনুভব করল সায়ান। বাইরের ঝড়টাও হঠাৎ ভয়ংকর বেগ নিলো। আইরিন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল সায়ানের উপর।

দৌড়ে মাজারের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। কেউ নেই। ঝড়ের সাথে অন্যরকম একটা বাড়তি ভয় মনে আসন গাড়ল। ভয়ে এদিক সেদিক সাহস সঞ্চয়ের উপাত্ত খুঁজতে লাগল। তখনই চোখে পড়ল জটা ধারী খাদেমটাকে। তার থাকার ঘরটির বাইরে বসে বসে ধ্যান করছে। শিমকীর মত বলে উঠল সে মনে মনে, 'নব্য ধ্যানা'। মোমবাতী গুলো সব নিভে শেষ। কবর হতে বাউন্ডারী দেয়ালের দূরত্ব চারদিকেই ১৫ ফুটের কম না। তবুও কবরটা পুরো ভিজে আছে। উপরের লালসালুর এক কোনা ছিঁড়ে উড়ছে বাতাসে পত পত করে। একটা কান্নার সুরের মত শব্দ লালসালুর সে উড়ে বেড়ানোর ক্রোধে। পাশের

পার্কের ভেতর আলো জ্বলছে। যাক বিদ্যুৎটা এখনও আছে। এটা খুবই আশ্চর্যের। অন্য মহল্লাগুলোতে দেখে এল বিদ্যুত মৃত। এখানে নিশ্চয় ধ্যানা পীরের বরকত এ বিদ্যুৎ রয়ে গেছে! তারপর নিজের মনে নিজেই হাসল সায়ান। শিমকীর সাথে কথা বলার পড় মোবাইলটা যে পকেটেই রেখে দিয়েছে খেয়ালহলো এতক্ষণে। যাহ! ভিজে শেষ। ডান পকেটে পলিথিন ব্যাগে কেবল মানিব্যাগটা। ওটা মোবাইলের জন্যই মূলত সাথে রাখা। শুকনো কাপড় এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ধ্যানা মিয়া পুরো এক পুকরের পানি শুকিয়ে দিলো আর তার মাজারে দাঁড়িয়ে একটা মোবাইল শুকাতে পারবে না সে। পারা উচিৎ। লাল সালুর দিকেই চোখ পড়ল।

হাতে ধরা লাল সালুর কাপড়। মুছছে মোবাইলটা।

সায়ান!

চমকে উঠলো । কে ডাকলো। খেয়াল করল তা একটা পা কবরের উপর উঠে আছে। খুব ভয় পেয়ে গেলো। আরে ওদের এক তলার ভাড়টিয়া কর্তাটি ডাকছে।

এদিকে এস! কি করছ। ধ্যানা পীর রাগ হবেন। লাল সালু দিয়ে মোবাইল মুছলে অমঙ্গল হবে তো।

ঠিক সেই সময় সায়ানের নাকে এল কড়া গানজার গন্ধ। খাদেম লোকটি দরজার সামনে বসে গানজা টানছে আনমোনে। সে কারনেই এ ব্যাটার কোন খেয়াল নেই কে এলো আর কে গেলো। ওদিকে লাল সালুর এক কোনা ছিঁড়ে উড়ছে, ছিঁড়ার পায়তারায় আরও অনেকদূর, খেয়াল নেই।

আস আস! চল। কোত্থেকে এত রাতে? এমনেতেই তুমি ছিনতাই কারীকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলে। দেখ দেখ কি কান্ড এই ঝড়ের মধ্যে এই খানে, আবার না অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে যাও। মাফ চাও মাফ চাও ধ্যানা পীরের কাছে। তাড়াতাড়ি। ইস্! লালসালুটা ছিঁড়েই গেছে, ধ্যানা বাবা রেগে গেলে কিন্তু মহল্লার খবর আছে।

না আঙ্কেল, মাফ চাওয়া লাগবে না। উনিই আমাকে মনে মনে ইশারায় বলেছন লাল সালু দিয়ে মোবাইল মুছলে আমার মনে সাহস আসবে, আর অজ্ঞান হবো না।

অজান্তেই ওমন উত্তর চলে এল তার মনে। এই প্রথম সায়ানের মনে হলো, আসলেই পুরাটাই ভূয়া। ঐ ধ্যানা পীরের চেয়ে বেশী ভূয়া এই শিক্ষিত কূপমুন্ডুকগুলো। আর সবচেয়ে চতুর এবং চালাক জটাধারী খাদেম পদবীর লোকটিই।

বাইরে ভয়াবহ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ঝড়ের ক্রোধ, বাতাস যেন ফুঁসছে ধরিত্রীর উপরে কোন রাগে। আইরিন তার সবটুকু আক্রোশ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে এই ব-দ্বীপের উপর। শেষ বিষ নিঃশ্বাসে চেষ্টা তার সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাণ কেড়ে নেয়ার।

চার দেয়ালে ঘেরা টর্চার রুমে বসেও কানে শব্দ আসছে। দেয়ালের এক কোনে সরু এক ফালি ভেন্টিলেটার দিয়ে হু হু বাতাস ঢুকে ঝড়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। শাহেদও তার তীব্র আক্রোশ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে আজগর মিয়ার উপর। গতকাল যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করেছে সে আসামীটির সাথে। কোন কারনে লোকটার ত্যাড়ামির পরিমাণ বেড়ে গেছে। কোন কিছুর সাহস ভূতের মত তার উপর ভর করেছে। মুখ-ই খুলছে না। আজ অবশ্য মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছে তবে খুব ধীরে ধীরে। ঠিক যেমন ঝড় একটু একটু করে বাড়তে থাকে আর বাড়তে থাকে তান্ডবের ফল। টর্চারের নতুন নতুন মাত্রা প্রয়োগ করতেই ধীরে ধীরে স্বীকার করতে শুরু করল অজ্ঞান পার্টিতে তার আগমনের ইতিহাস।

এসব ইতিহাসে সবসময়ই কিছুটা সমাজের দোষ থাকে, জানে শাহেদ ভাল করেই। তাই এ নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। তার মাথা ব্যাথা শিকড়...শিকড়ের বাসিন্দাদের, শিকড়ের সাথে শিকড়ের কানেকশন। সে ঠিক মূলে আঘাত হানতে চায় এবং সেটা দেরী করলে আর হবে না। শিকড়ের উপরে দ্রুত গজিয়ে উঠবে অজস্র নতুন নতুন মাটি, বালুর কঠিন স্তর, বাধ।

এক ঘন্টা পরই ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। চোর বাটপারদের যেমন গণ পিটুনী সহ্য করারা অসম ক্ষমতা থাকে, অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবার দারুন ক্ষমতা থাকে। ব্যাটা কখন ওঠে কে জানে?

তবে লোকটার একটা কথা সিমপ্যাথির উদয় ঘটিয়েছে শাহেদের মনে। কিছু একটা করতেই হবে। সকালে ঝড় থামলে খোঁজ নিতেই হবে। মনে মনে স্থির করল শাহেদ।

আজগর মিয়ার ভাষ্য মতে ছোট একটা মেয়ে আছে তার। বৌ আর একমাত্র মেয়েটা থাকে পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় নিভৃত গ্রামে। ঝড়ের কারনে তাদের নিয়ে ব্যাচারা খুব টেনশন করছিল।

অপরাধ করার সময় মানুষের এই সম্পর্কেও কথা একটুও মনে থাকেনা কেনো, সেটা জটিল এক গবেষনার বিষয়। সাইক্রিয়ার্টিস্টরা কি এ নিয়ে গবেষনা করেন নি? কে জানে?

বাড়ী ফেরার উপায় নেই। অগ্যতা চেয়ারে বসে রাতটা পার করতে হয় কি না? হঠাৎ মনে হলো একবার রুমকী কে ফোন করলে কেমন হয়। দারুন হয়।

যা ভাবা সেই কাজ।

হ্যালো, কে রুমকী বলছ?

জি মামা।

ওহ নো, এভাবে শুরুতে মুড অফ করে দিলে নেক্সট স্টেপ গুলো আর কেজো থাকে না। আর বলবা, বল কখনও বলবা?

চিন্তা করতে হবে। তা এত রাতে ঝড়ের মধ্যে কোথায় গো মা..না..না... ওকে, হবু সোয়ামী।

এইটা মন্দ না। বলতে পার।

অফিসে। আজগর মিয়ার মুখ খুলছিলাম। বেচারা মুর্ছা গেছে।

আপনারা পুলিশরা না ঠিক আমাদের উল্টো। আমরা মানুষের জ্ঞান ফেরানোর জন্য প্রাণপণ লড়ে যাই আর আপনারা কথা নেই বার্তা নেই ডান্ডা মেরে একেবারে ঠান্ডা করে দেন। দেখেন আবার ভাগ্নের আক্রোশে মেরে টেরে ফেলেন না।

ডাক্তার বউ আছে কি জন্যে। মরতে বসলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। তোমার মা বাবা কেমন আছে?

বাবা বিয়ের আয়োজন নিয়ে পরিকল্পনায় বসেছেন। শিমকীর সাথে। মা একটু অসুস্থ। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। ভাইয়ার জন্য খুব টেনশন করছেন।

তোমার ভাইয়া আর ফিরবেন না কোনদিনই?

না মনে হয়। বিয়েতে আসতে বলেছি। কথা যা বলার একমাত্র কালে ভদ্রে আমার সাথেই বলে ও। তাও ঐ যখন বান্দরবান শহরের দিকে আসে তখন। ভাইয়া আসলে একটু অন্যরকম, আপনি বোধহয় ভাইয়াকে দেখেন নি কখনও।

না, তোমার ভাইয়ার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়নি কখনও।

ভাইয়া ছোট বেলা থেকেই একটু অন্যরকম। ওর সাথে আসলে সমাজের কোন কিছুরই খাপ খেতো না। একবার হলো কি, তখন আমি সবে মাত্র ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছি। ভাইয়া ঐ মেডিকেলেরই তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। সরকার ঘোষনা দিল, বিনা অনুমতিতে সরকারী অফিস টাইমে ঢাকা মেডিক্যালের কোন ডাক্তার কোন রকম প্রাইভেট প্রাকটিস, সার্জারি, কনসালটেন্সি করতে পারবে না। ধরা পড়লে বিভাগীয় আইনে শাস্তি হবে। এক এসোসিয়েট প্রফেসর পলিটিক্যাল রোষের কারনে সবার আগে ধরা খেলেন। সব ডাক্তার, সব দলের এক সাথে ঐ আর্থিক স্বার্থ ক্ষুন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। উছিলাও পাওয়া গেলো ঐ বরখাস্ত ডাক্তার এর বদৌলতে। কর্মবিরতি দিলেন অনির্দিষ্টকাল। এতো এদেশে খুবই স্বাভাবিক। মেডিক্যালের

করিডরে কাতারে কাতারে গরীব রোগীরা পড়ে কাতরাচ্ছে। কারও রক্ত দরকার, কে দেবে? কারও দরকার স্যালাইন, কে ব্যবস্থা করবে? মানুষ বাঁচানোর স্থান হয়ে উঠেছে তখন শশ্মান ঘাটের প্রাথমিক সূতিকাগার। মৃত্যুর জন্য কষ্টকর প্রহর গুনছে লোকগুলো। টাকা পয়সা একটু আছে যাদের রোগীকে প্রাইভেট ক্লিনিকে স্থানান্তর করছে। কি করবে? আমরা ছাত্র ছাত্রীরা সে সব দেখে কেউ কষ্ট পাচ্ছি। কেউ আবার স্যারদের সাথে গলার সুর এক করছি। সুদৃষ্টি পড়তে পারে তাদের। এভাবে তিনদিন কেটে গেছে। ক্লাশ চলছিল ঠিকমত। ক্লাশ থেকে ভাইয়ারা কয়েকজন বের হয়ে মেডিকেলের করিডর এর পাশ দিয়ে হেঁটে ফিরছিলেন। ডাক্তারদের একদল পাশে মাইকে চিৎকার করে আন্দোলনের বেগ আনছে। একটা মহিলার চিৎকার কানে ভেসে আসে ভাইয়াদের। সেই মাইকের চ্যাঁচাম্যাচির মাঝেও। দৌড়ে যান। মহিলাটা মরেই যায় ভাইয়ারা পৌঁছাতে পৌঁছাতে, সদ্য জন্ম নিতে থাকা বাচ্চাটাও। ভয়াবহ এক দৃশ্য। দ্রুত ভাইয়া ডিন স্যারকে ডেকে এনে দেখান। উনি মর্গে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তারপর ভাইয়া ক্ষেপে ওঠেন। দ্রুত সব ক্লাশ ছেড়ে সব ছাত্র ছাত্রীদের নেমে আসতে বলেন। লাশটা আর মরা বাচ্চাটা নিয়ে শহীদ মিনারে শুইয়ে দেয় ভাইয়া আর তার বন্ধুরা ক'জন। মাইকে ঘোষনা দিয়ে দেয়, যতদিন ডাক্তারা চিকিৎসা শুরু না করবে, সব ক্লাশ বন্ধ। শুধু তাই না মেডিক্যালের সব গেট ছাত্র ছাত্রীদের বন্ধ করে দিতে বলা হয়। কোন ডাক্তার গেটের বাইরে যেতে পারবে না। আগে এই মহিলার মৃত্যুর দায়ভার স্বীকার করতে হবে। তারপর সেই লাশ আর বাচ্চাকে নিয়ে ভাইয়ারা হাজির হন একেবারে প্রাইম মিনিষ্টারের কার্যালয়ের সামনে। প্রধান মন্ত্রী ভাইয়াদের কে কথা দেন স্পেশাল তদন্ত হবে ঐ মৃত্যুর। যদিও পরে আর কিছু হয়নি। বরং দেখা যায় ধীরে ধীরে সরকার আইনটিই উঠিয়ে নেন। ভাইয়া বুঝতো কিছু হবে না। কিন্তু ঐ গর্ভবতী নারীর ওমন মৃত্যুতে চুপ থাকতে পারেন নি। এমনেতে ভাইয়া চুপচাপ থাকেন, কিন্তু প্রতিবাদী হয়ে উঠলে তার চেহারাটাই পাল্টে যেত। তারপর আবার কিন্তু শান্ত সুবোধ ভালো ছাত্র।

কঠিন। জানি তো কিছু কিছু । তোমাদের এই এলাকায় তার সুনামতো মুখে মুখে। পারলে একবার নিজে কথা বল ওনার সাথে। আসতে বলো। বলো আমি বলেছি।

আসলেও বাসায় উঠবে না। গত বছর মে মাসে একবার এসেছিলেন। শিকমীর ডেঙ্গু হলো। বাসায় ওঠেনি। শুধু আমার সাথে ধ্যানা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা খেয়ে হাসপাতালের ঠিকানাটা নিয়ে চলে গেলো। একটুও বসলোনা। চোখে পানি দেখে হাতটা বাড়িয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, কাঁদিস নে , সবাইতো সমাজের হতে চায়। কিন্তু সমাজ তিনভাগে ভাগ করে রাখে মানুষকে। এক দলকে সমাজের নিজের মত হয় আরেকদলকে সমাজ স্থান

দেয় ঠিকই কিন্তু সমাজ তাদের ঠিক নিজের হয়ে ওঠে না কখনও। আসলে বেশীরভাগেরই নিজের হয় না। আর আরও দু'একজন থাকে যাদের সমাজ কাছেই রাখতে চায়না। আমি সেই তৃতীয় দলে পড়ে গেছি।

ঝড়টা মনে হয় একটু হালকা হয়ে আসছে। বের হবো নাকি? কি বল হবু বউ।

আপনি রেষ্ট নেন। পাগল হয়েছেন।

এখনই এত কেয়ার।

ইউ নো সায়মার মামা, আমি যথেষ্ট কেয়ারীং একটা মেয়ে। এ ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ মনে রাখা উচিৎ নয়।

আবার মামা।

নট মাই মামা, আই টোলড সায়মার মামা। এটাও কি ভুল? তবে 'মামা' আমি বলব। কখন জানেন,

কখন ।

আগামী শুক্রবার রাতে। রাখি। ভাল থাকুন। একটু ঘুমিয়ে নেন। ঝড় কমতে দেরী আছে। সকালের আগে মোটেও বাইরে বের হবেন না। একদম বলে দিলাম। হুশিয়ার।

মাথা থেকে আজগর আলীর মুখটা সরে এখন রুমকীর মিষ্টি মুখটা ঘুরা ফেরা করছে। চোখটা বন্ধ করে সেই মুখের সাথে নানা কল্পনা গড়ে তোলায় ব্যাস্ত হলো সে। ঝড়ের তান্ডব গর্জনও এখন মিষ্টি রাগের সুর মনে হচ্ছে শাহেদের কাছে।

ইতিমধ্যে বন্ধু জুয়েলের বাবা, জুয়েলের মা প্রত্যেকেই দু'তিনবার করে এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন রেশাদের। বেবীতো একটু পরে পরেই আসছে। রেশাদ বেবীকে মানা করে দিল।

দেখ বেবী, এভাবে বারবার কেনো খবর নিতে হবে? আমার কোন ভয় করছে না। আমি এই যে এই বইটা নিয়ে বসেছি। এটা পড়ত পড়তে সময় কেটে যাবে। তবে একটা কথা কেবল বলে যাও, ঝড়ে এই ঘর ভেঙে পড়ার কোন উদাহরণ নেই তো ।

না, বলে বেবী তার মিষ্টি সুরেলা হাসিতে ঝড়ের মাঝে আরেক ঝড় তুলে চলে গেলো। সৃজয়ার ছায়া মনে স্থায়ীভাবে না ছেপে থাকলে আর বন্ধুর ছোট বোন না হলে বোধহয় এই উপজাতি বম মেয়েটার এই হাসি তার মনে আরও আগেই তার উদাসীনতায় পঁচন ধরাতো। কিন্তু সে গুড়ে বালি। এখানে রেশাদ খুবই পূজনীয় ব্যক্তিতে পরিচিত হয়ে আছে। চারবছরের ডাক্তারি বিদ্যেটাও তার কাজে লাগে। যদিও সে মনে মনে পণ করেছিল ঐ আধা আধি বিদ্যে দিয়ে কারও চিকিৎসা করবে না কোনদিন। কিন্তু এই নির্জন নিরালায় মানুষের অসহায় আর অসুস্থতায় কাতরানি দেখে সে সব পণ কবেই টুটে গেছে। কুসংস্কার তো এদের জীবনেরই অংশ। না হয়ে কি উপায়, যখন কোন উপায় থাকে না সমাধানের মানুষ তো সেই পাহাড় পর্বত আর ভীতিজাগানো বস্তুর কাছেই চাইতে বাধ্য হয়। ডুবে যাওয়া মানুষ খড় কুটোও ধরে ভাসতে চায়। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আসলে। পরিস্থিতি, সময় আর অবস্থান মানুষ এর মাঝে সব কিছুর উদ্ভব ঘটায়। চিকিৎসা ঠিক সেভাবে রেশাদ করে না। তবে পরামর্শ দেয়। সঠিক সময়ে বান্দরবান সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়। অনেক, অনেক করেছে এবং করেই চলেছে সে এই ছোট্ট পাহাড়ী বসতির জন্য।

দূরে একটা শব্দ শুনে তাকাল । উঁচু পাহাড়ের এক পাশে গড়ে ওঠা একটা ঘর দুমড়ে মুচড়ে নিচে পড়ে গেলো ঝড়ের দাপটে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ঠিক সেই সময় ছুটে এলো বেবী।

বাইরে বাজারের এক পাশে একটা বড় সেগুন গাছের তলে একটা ভীড় দেখা যাচ্ছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে ভিজছে সবাই। বেবীর পিছে পিছে সেদিকে ছুটল সেও। একটা মেয়ে পড়ে আছে একটা বন্ধ দোকানের সামনে ভেজা মাটিতে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে নানা রকম ভয় ভীতি ফুটিয়ে তুলেছে নিজ নিজ চেহারায়। মেয়েটার উর্ধ্বাঙ্গে কোন পোষাকের বালাই নেই। রেশাদ কেওকারাডং যাবার পথে উঁচ পাহাড়ের অধিবাসী নারীদের দেখেছে ওমন উন্মুক্ত উর্ধ্বাঙ্গে। সভ্যতার এত কাছে থেকেও পাহাড়ের আড়ালে এরা এখনও সে সব পোষাকী সভ্যতার হদিস পায়নি। আর তাই বোধহয় কোন সভ্যতার সংস্পর্শে আসা মানুষের শিকার হতে হয়েছে। রেশাদ কাছে যেতেই দেখল এখনও শ্বাস চলছে। একটু হাত নেড়ে যা বলতে চাইল মেয়েটা তাতে মনে হলো তার উপর পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে। মেয়েটা হাত উঁচিয়ে অস্ত্র দেখানোর চেষ্টা করল। হতে পারে তার ধর্ষনকারী কোন অস্ত্র ধারী। তারপর হাতটা থেমে গেলো চিরতরে। মরে গেলো নির্যাতিতা মেয়েটা।

বেবী চিনল মেয়েটা মুরং উপজাতির। এরা আরও উঁচু এলাকায় বাস করে। কিন্তু রুমা বাজারে কি করে এলো?

ঝড়েও উড়িয়ে আনতে পারে। কেউ একজন পাশ থেকে বলে উঠল। এমন সময় দুজন আর্মির লোক কে মাথায় ছাতা নিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ক্যাম্প

থেকে নেমে আসতে দেখা গেলো। রেশাদকেই জিজ্ঞেস, কি হয়েছে রেশাদ ভাই?

দেখেন, কোন পাশন্ড কি করেছে। এই তো আমরা মানুষ। উহ ! নেন বান্দরবানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, পোষ্ট মর্টেম করা উচিৎ তো নাকি?

আর্মি দুজন বান্দরবানে ওয়্যাল্যাসে কন্টাক করার চেষ্টা করলো। ঝড়ে সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছিল না।

স্থানীয় কিছু লোক ঝড়ের মধ্যে লাশ রাখতে দেবে না। সৎকারের জন্য তারা ব্যতি ব্যস্ত হলো। লাশ এভাবে পড়ে তাকলে ঝড় তাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি করবে। তাদের ওমন বিশ্বাসের জন্য শেষ পর্যন্ত লাশটা ভু-গর্ভস্থই করা হলো। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ঝড় তারপর আরও প্রচন্ড রূপ ধারন করল। দূরে উঁচুতে সেগুন বাগানে অনেকগুলো গাছ ভাঙার শব্দ শোনা গেলো অনেকক্ষণ ধরে। সে শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রবল আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে।

আর্মি ক্যাম্প থেকে রেশাদকে বলা হলো ওদের সাথে উঁচু ক্যাম্পে গিয়ে উঠতে। রেশাদ মানা করল। বলল, মানুষ একবারই মরে। আর্মিরা সাবধানে থাকতে বলে বিদায় নিয়ে ক্যাম্পে চলে গেলো।

ঘরে ফিরে খুব কাঁদছিল বেবী।

রেশাদ বলল, দেখো বেবী আমি জানি এমন কত শত উপজাতি মেয়েকে সম্ভ্রম আর জীবন দিতে হয়েছে। এতো পাহাড়ের আড়ালে। ঐ ইট পাথরের সভ্য জগতেও এমন রোজ কত নারী অকালে সম্ভ্রম আর প্রাণহারায়। এখানে তো একটা বিস্তর সময় পার হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে, যুদ্ধে নারীরা কার যে শিকার হবে প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা খুব কঠিন হয়ে ওঠে।

আজ তো তবুও অনেক শান্তি এই তোমাদের এই সব পাহাড়ে। আমি বা আমার মত কত সমতলের বাসিন্দা মিলেমিশে বাস করতে পারছি। যদিও আমি জানি এটারও খারাপ দিক আছে। তোমাদের আবাস অথচ ধীরে ধীরে তোমাদের সংখ্যাই কমে যাচ্ছে। তবে সব কিছুরই ভাল খারাপ থাকে। তোমার ভাই আজ কত নাম করছে ডাক্তার হয়ে, এই মিলন মেলা না হলে এগুলো তো হতো না। তবে এখনও এমন নির্যাতন আমি একটু অবাকই হয়েছি।

আর কত, আর কত রক্ত চায় এই পাহাড়, আর কত?

বেবী, ঠিক পাহাড় না, এই পৃথিবী , এই পৃথিবী।...কেউ জানো না, কেউ না।

রুকমীর মা সারা রাত ঘুমাতে পারেন নি। অহেতুক ভয়ে এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছেন। স্ত্রী কে তাই আর ডাকলেন না। একাই উঠে ফযরের নামাযটা পড়লেন তারপর জায়নামায থেকে উঠে বারান্দার দিকে এগোলেন।

বাতাসের তান্ডব থেমেছে অনেক আগেই। শীত ক্লান্তি বিলাস সময় এখন ভূবনটার। সূর্য হালকা কুয়াশার চাদরটা জড়িয়ে উঁকি দেয়ার পায়তারা করছে। বারান্দার রেলিংয়ে দুটো হলদে পাখী এক সাথে এসে বসলো। কোথায় ছিল এই পাখী গুলো রাতের প্রচন্ড ঝড়ে? কথাটা মনে হতেই মনটা ঠিকই তার উথলে ওঠে। তিনি জানেন রেশাদের চিন্তাটা তার স্ত্রীকে শংকিত করেছে বলেই ঘুম পরাজয় বরণ করেছে। তিনিও কি কষ্ট পান না? অবশ্যই পান। কিন্তু সমাজ আর পরিস্থিতি কিছু কাজ মানুষকে করিয়ে নিতে বাধ্য করে। মানুষের ঠিক বোঝার থাকে না কি করা উচিৎ। তখন সে নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির দাস হয়ে সুবোধ হয়ে ওঠে। পাখীর সুরে রেশাদের জন্য উতলা হাহাকার তার মনেও বিষ বাস্প বইয়ে দিচ্ছে তো। চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল তারও আসে। এই তো সময় সে জল ঝরানোর। কেউ দেখছে না। অন্য সময় দায়িত্ব তো অনেক। তিনি অধিপতি একটা পরিবারের। দূর্বলতা সেখানে হারাম।

যাক ঝড়টা থেমেছে। রুকমীকে কি বলবে, মা তোর ভাইটার একটা খবর নে না। ওদিকে রাতে না জানি কি প্রলয় লীলা হয়ে গেছে। কিন্তু সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। অনেক।

ধীরে ধীরে সূর্য চোখ মেলে রাতের প্রলয় দর্শনে লিপ্ত হলো। রেশাদের বাবা বারান্দায় বসে রেশাদের কথা ভাবতে ভাবতে সূর্যের সাথে দেখে নিলেন বড় রাস্তার মোড়ে সেই কবেকার কৃষ্ণচূড়া গাছটার একাংশ ভেঙে পড়ে আছে নিচে। লোকজন দু'একজন নেমেছে পথে। এখানে সেখানে একটু গর্ত পেলেই সেখানেই জমে গেছে পানি।

টিভিটার সুইচ অন করলেন। এই না হলো সভ্যতা। এমন একটা টপিকস, বিজনেস তো এখানেই। পৌঁছে গেছে রিপোর্টাররা উপকূলের কূলের ধারে। একটা লাশ না পেলে ক্যামেরাম্যানের কারিগরী বিদ্যাই বৃথা। লাশ এর লাইভ ছবি চ্যানেলে চ্যানেলে। চ্যানেলগুলো আজ খবরে খবরে খবরী হয়ে ভাল টিআরবি তৈরী করায় ব্যস্ত হবে।

ব্রেকিং নিউজ এক চ্যানেলে , 'দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে হারিয়ে গেছে ১০৭ টি মাছ ধরার ট্রলার।' ১১০ বা ১০০ না বলে ১০৭, বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয় তা হলে ব্যাপারটা। এসবই নব্য সভ্যতার উদাহরণ। উপকূলের নিকটবর্তী সব

অঞ্চলের অনেক খবরাখবর আসছে একটু পর পরেই। কিন্তু পাহাড়ি এলাকার কোন খবর নেই। ওখানে তো বাস করে গুটিকয়েক আদিবাসী। কে তাদের খবর জানার জন্য বসে আছে। ওরা তো আদি কিংবা উপ। কটা রেশাদ আর লুকাতে গেছে ওখানে। সমতলের যারা তারাও তো ঘরছাড়া। ছিন্ননিড়ের বাধ্যবাধকতায় তুচ্ছজ্ঞান সভ্যতায়।

সায়ানের সদ্যসুস্থ দেহ ঐ ঝড়ের ধকল সইতে পারল না। সকালেই বেদম জ্বরে পুড়ে যেতে লাগল গা।

খবরটা কানে আসার পর আর দেরী করেনি শিমকী, বারবার মোবাইলে কল দিল। বেচারা সায়ান তখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সায়মাপুর দেয়া ঘুমের ঔষধ গিলে।

রাগটা কমানোর কোন উপায় না দেখে, বাসা থেকে বের হয়ে বড় কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ডালটার পাশ থেকে একবার ঘুরে এলো। আপিকে যে বলবে ও বাসায় যাবার কথা, তাও উপায় নেই, এখন সে ও বাড়ীর ভাবী বধূ। দূর!

বাসায় এসে বাবার পাশে বসে টিভিতে গতকাল আইরিনের ধ্বংসলীলার ক্ষয়ক্ষতি আর আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাণ উজাড় করা, মন খোলা সংলাপ শুনতে বসল। ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। সংলাপের বিরক্তিতে আনন্দের জোয়ার সেটা। সায়ান নিজেই ফোন দিয়েছে।

জ্বরটা বাধালেই!

দেখতে তো এলে না।

ফাজলামি রাখ। জ্বর কেমন বলো।

বলব না, এসে দেখে যাও।

কেমন করে আসব। কি কাজে আসব? তবে বিকেলে আসতে পারি , ঐ যে আপির কিছু কাজ আছে সায়মাপুর কাছে। তখন। লক্ষ্মী সোনা, শরীর বেশী খারাপ লাগছে।

হুঁ , মাথাটা বন বন করে ঘুরছে। একটু এসে হাতটা বুলিয়ে দিলে...

আরেকটু ঝড়ের মধ্যে বের হবে না, এক্কেবারে কি হয়ে গেছে উনি, ঝড়ে এক একা হাঁটছে রাস্তায়। আমার কি ইচ্ছে করে না ...

আচ্ছা আমরা খুব ঝমঝম বৃষ্টিতে একদিন এক সাথে হাঁটব।

একদিন মাত্র। অবশ্য যেমনে জ্বর বাঁধাইছ...তোমার সাথে, ওসব বৃষ্টি ভেজা টেজা হবে না।

তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে। ধ্যানার মাজারের লালসালু দেখলাম, রাতে ঝড়ে ছিঁড়ে একাকার। টিনের চালও খুলে গেছে দুটো। পানিতে থৈ থৈ ধ্যানার কবর। ব্যাটা কিচ্ছু করতে পারল না। খুশি হয়েছো।

আমার খুশির কি এতে। মানুষ তো খুশি হয় নি। গিয়ে দেখ এতক্ষণে মাজারের সব ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে। নতুন ঝকমকে লাল কাপড় উঠেছে।

মানুষ দলে দলে সেজদা করতে আসছে। দোয়া চাচ্ছে ধ্যানার কাছে। ধ্যানার মত পীরদের ভক্তের অভাব হয় না।

কেনো আমি জানি। মানুষের মনের ভেতরে সব যে সমস্যা।

তাই নাকি, তা তোমার মনে কি সমস্যা।

তুমি ঘোরাফেরা কর, মাঝে মাঝে একটু বেশী বেশী।

উফ! কি সুন্দর, গলে গেলুম গো। ঝরে যাবার আগে ধর আমায়। শোন বিকেলের আগে যেন দেখি একদম গা ঝেড়ে উঠেছ। বুঝলে? বা বাই।

জ্বর কমবে কি? দুপুরের পর থেকে সায়ানের মোবাইলে একটু পর পরই হুমকি আসতে শুরু করল। ভয়াবহ কথা। তাকে বলতে হবে, সে আজগর আলীকে চেনেনি। আরেকবার চিনেছি বললেই ধ্যানা পার্কের পাকুর গাছ তলায় লাশ হয়ে পড়ে রবে।

সায়ান ঐ হুমকির কথা ছোট মামাকে ছাড়া আর কাউকে জানাল না। এমনকি শিমকীকেও না।

বিকেলে শিমকী আর রুমকী এল সায়ানদের বাসায়। জ্বরটা সত্যি শিমকীকে দেখে পালাল দূরে কোথাও। হয়তো ধ্যানার মাজারেই। ওটা লুকানোর ভাল জায়গা।

সন্ধ্যার দিকে দু'বোন চলে যাবার পর তাই জ্বরটার খোঁজে ওদিকেই পা বাড়ালো সায়ান। মা মানা করলেন। শুনলনা।

ছানার চা এর দোকানটা ভেঙে পড়েছে এক কোনায়। দোকানের ছেলেটা সেই ভাঙা জায়গাটা মেরামতে ব্যস্ত। আর কোন দোকান বসে নি। কেবল একটা ঝালমুড়ি ওয়ালা মাত্র এসে দোকান বাসনোর কাজ করছে। শিমকী তো ঠিকই বলেছে, মাজারে লোকজনের আনাগোনা অন্যসময়ের যেয়ে বরং বেড়েই গেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল রাতের সেই বিধ্বংস অবস্থা নেই। গাঁজা খোর খাদেম খুব ভক্তি নিয়ে খেদমত এ ব্যস্ত। সালুর লাল রঙ আরও ঘন হয়ে নিরবে যেন বিজয় উল্লাস প্রকাশ করছে। মোমবাতি একটা নেভার আগেই কোননা কোন ভক্ত আরেকটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আসলে কবরের ভেতর ভীষন অন্ধকার তো। যদি ধ্যানা পীরের সে আঁধারে ভয় করে। কিন্তু বেঁচে থাকতে যে জীবনের ৯০ ভাগ সময় চোখ বুজেই কাটালো তার আবার আঁধার আর আলো!

বন্ধুদের মধ্যে দুজনকে পাওয়া গেলো। নয়ন আর ইফতি। হঠাৎ কানের পাশে স্পষ্ট শুনলো - আমাদের কথা না শুনলে লাশ হয়ে যাবে।

লোকটা সোজা হেঁটে মাজার পেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তাকাল । সায়ানের দিকেই। বাসের সেই বেমানান দৃষ্টি, চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। তারমানে ওরা দল বেঁধেই ছিল বাসে।

দৌড়ে কি লাভ? চেয়ে চেয়ে লোকটার চলে যাওয়াই দেখলো শুধু। বন্ধুদেরও কিছু বলল না।

পনের

আজ টর্চার রুমে নয়। হাজতের ভেতর ঢুকে খুব কাছে গিয়ে বসল শাহেদ।

আজগর মিয়া বসে বসে কাঁদছিল।

কাঁদছো কেনো? মেয়ের জন্য! আমি খোঁজ নিয়েছি। তোমার বউ আর মেয়ে খুবই ভালো ছিল। সময় মতো ওরা ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে পেরেছিল। তবে তোমার বাড়ীটারর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমি কিছু সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। খেপুপারার ইউএনও আমার বন্ধু।

এই যে আমার মোবাইলটা বাজছে, আমি নিশ্চিত এটা তোমার মেয়ে করেছে। আমি নিশ্চিত। হুঁ, ঠিকই। তোমার সাথে কথা বলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। নেও কথা বল।

কিন্তু তুমি কোথায় সে বিষয়ে কিচ্ছু বলবে না।

জি স্যার, আপনার পা দুটো ছুঁয়ে একটু সালাম করি, দেন পা দুটো দেন।

লাগবে না। তোমার জন্য আমার কোন মায়া দয়া নেই। সবটাই তোমার মেয়েটার জন্য। আমি নিজে কথা বলেছি। মাত্র সিক্সে পড়ে অথচ কি স্পষ্ট কথা, ভীষণ মায়া মায়া একটা ব্যাপার তোমার মেয়েটার কণ্ঠে। পারলে মেয়েটাকে গান টান শিখিও। এখন নাও, রিসিভ করে কথা বল।

ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরেই আজগর মিয়া অঝোরে কেঁদে ফেলল। মা তুই ভাল আছিস? বেঁচে আছিস তো? তোর মাকে বলিস, আমার আসতে একটু দেরী হবে। সব একটু কষ্ট করে সামলে নিতে বলিস। আর আমি একটা নম্বর বলছি, ঐ নম্বরে যে ফোন ধরবে তাকে বললে বেশ কিছু টাকা দিয়ে যাবে। তার কাছে আমি টাকা পাই অনেক। ...আচ্ছা থাক নম্বরটা মনে আসছে না।

শাহেদ এইবার একটু হাসলো। কানে কানে বলল, নম্বর বলে দাও। না হলে আমি নম্বর তোমার মুখ দিয়ে আদায় করে নেবো। ভয় নেই এ ব্যাটা টাকা দিতে আসলে আমি ধরব না। ধরব তার পরে।

আজগর মিয়া কি একটা ভেবে নম্বরটা মেয়েকে বলে দিল। তারপর মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চোখের পানি মুঝতে মুঝতে কেটে দিলো লাইন।

স্যার আপনি আমার যে উপকার করলেন। আমি...এত বড় পাপী আপনার কাছে ...আমার কিছু বলার ভাষা নেই স্যার। তবে স্যার একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না, আপনি যতই টর্চার করেন আমার ঐসব তথ্য নিয়ে আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। আমি ছিঁচকে অপরাধী হলে কি হবে, নিয়ন্ত্রন অনেক গভীরের। আপনি প্রমাণ কার কাছে দেবেন, সব ম্যানেজ করা আছে। কোন লেভেলে ত্রুটি নেই। আপনি ফেরেস্তার মত একটা মানুষ। আপনার ভালোর জন্য দুটো কথা ছিল স্যার?

বল।

প্রথম কথা, স্যার একটু কাছে আসেন, আপনার এই ইনচার্জ কাদের সবচেয়ে বড় হারামী, টাকার জন্য সে আপনার গলায় ছুরিও চালাতে পারে।

আর স্যার দ্বিতীয় কথা, আপনি সামনে খুব বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছেন। আমাদের হাইকমান্ডে আপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার নীল নক্শা করা হচ্ছে এবং আপনার কাছে আমি দু'একজনের নাম প্রকাশ করায় আমার জন্য ও খুব ভাল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে না। আমি জানি। আমার টা আমি ম্যানেজ করেও নিতে পারব। আমার মত এত বড় এজেন্ট ওরা হাত ছাড়াও করতে চাইবেনা। আপনি সাবধানে থাকবেন স্যার। সায়ান মানে আপনার ভাগ্নে যে মরে নি সেটাও আমি জানি স্যার। ঐ পয়জানে মানুষ মরতেই পারে না। ওটা বিশেষজ্ঞ দ্বারা গবেষনা করে তৈরী করা। সায়ানকে সম্ভবত মোবাইলে ভয় ভীতিও দেখানো হচ্ছে । ওটা আপনাকে কাবু করার জন্য। আমি বন্ধ করাতে পারব। একটা কল করতে দেবেন। তবে স্যার নম্বরটা আপনাকে দেয়া যাবে না। দয়া করে যদি এই কথাটা রাখতেন।

ঠিক আছে। করো।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে কাকে কি সব নির্দেশ দিয়ে মোবাইলটা বাড়িয়ে দিলো শাহেদের দিকে আজগর। নম্বর অবশ্যই ডিলিট করে।

এই দৃশ্যটাও কাদের মিয়া চোখ এড়াইনি। সে জানত মেয়ের সাথে কথা বলার কথা। কিন্তু দুই বার কেনো সেটাই খটকা লাগছে। চুপ করে বিষয়টা গিলে নিলো। কাজে লাগতে পারে।

স্যার শেষ একটা অনুরোধ। কাল তো আপনি আমাকে শেষবারের মত রিমান্ডে নেবেন। আমার সামনে কাদেরকে আসতে দেবেন না। তাতে আমার আপনার দুজনারই সমস্যা বাড়বে।

শাহেদ মনে মনে কি যেন চিন্তা করর। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কি রিমান্ডে নেব তোমাকে? আশা করছি তুমি আমাকে এমনেতেই টাইম টু টাইম হেল্প করবা। তবুও ফরমালিটিজ। আজ রাতেই সেটা শেষ করব। কাল তো বুধবার। পরশু থেকে আমার ছুটি। তার উপর আজ রাতে কাদেরের ডিউটি নেই।

ঘরোয়া পরিবেশে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন হওয়ার কথা থাকলেও নিমন্ত্রনের লিষ্টটা শেষ পর্যন্ত কম লম্বা হয়নি। সে কারনে ছাদে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে মাঠে প্যান্ডেল করেই করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই এলাকার হাই স্কুলটা সায়ান আর শিমকীদের বাড়ীর খুব কাছেই। রুমকীর বাবাও ঐ স্কুলের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য। তাই ঐ মাঠে আয়োজনের অনুমতি পেতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। শেষমেষ তাড়াহুড়া করে একটা সুন্দর বিয়ের কার্ডও ছাপানো হয়ে গেলো। রেশাদের মহল্লার কিছু বন্ধু বান্ধব ওসব ছোট খাট ব্যবসা নিয়ে আছে। ওরাই দ্রুত করে দিলো সব। তাদের প্রিয় বন্ধু কাম গুরু-রেশাদের বোনের বিয়ে, তারা আসবে না তা কি হয়।

সকাল থেকে রুমকীর বাবা রান্নার তাদারকিতে খুবই ব্যস্ত। এই লোকটি তার বড় মেয়ের বিয়েটাতে খুবই আনন্দ উপভোগ করছেন। এই আনন্দ আসলে গভীর এক দুঃখ আড়াল করার একটা উপায়ও হয়তো।

নিকট আত্মীয় যারা দূরে থাকেন তারা অনেকেই বাসাতে হাজির হতে শুরু করেছে। রেশাদের মা তাদের নিয়ে ব্যস্ত অথচ মনে তারও ভীষন একটা কষ্ট ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি শত চেষ্টা করছেন সেই কষ্টটার বহিঃপ্রকাশ না ঘটাতে। ওটা অন্য কারও নয়, সেটা তার একান্ত নিজের। কিন্তু অপেক্ষা ঠিকই করছেন। মনেমনে ভাবছেন, এবার এলে হয়, নিশ্চয় ওর বাবার রাগ আর ওর অভিমান এতদিনে ভেঙেছে। কিন্তু সত্যি সেই ভুল বোঝাবুঝির কি অবসান হয়নি?

দুপুর ১:৩০ টা বাজছে ঘড়িতে। মনের মত করেই সব গোছানো হয়েছে। এত অল্প ক'দিনে এত আয়োজন সম্ভব হয়েছে নিজেই খুব অবাক হলেন রেশাদের বাবা। খাওয়ার দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তার দুই ভাইয়ের ছেলেরা খুব খাটছে কাজিনের বিয়ের জন্য। রেশাদের মহল্লাতো বন্ধুগুলোতো আছেই। রেশাদরে বাবা তাদের সে সব স্বপ্রণোদিত কর্মকান্ড মন থেকেই মেনে নিয়েছেন। কেনোই বা নেবেন না? রেশাদ যে তার শত মনে শতকোটি পদ্মফুলে সাজানো পুত্র। অথচ কত গোপনে তিনি রেখেছেন সেই পদ্মের সুবাস।

এখনও বর বধূর কোন খোঁজ নেই। মেয়েদুটোও গেছে সেই কখন। পার্লারে এতক্ষণ লাগে নাকি। একটু বিরক্ত হলেন মনে মনে রেশাদের বাবা। ছোট মেয়েটাকে ফোন দিচ্ছেন বারবার। তাড়া দিচ্ছেন।

শিমকী কি আর বলবে, হ্যাঁ বাবা এই তো শেষ হলো প্রায়। বাবা, বর পক্ষ রওয়ানা দিয়েছে?

রওয়ানা দিচ্ছে বললো তো।

শিমকীর সাথে ইতিমধ্যে বাবার এই একইরকম কথপোকথন বেশ কয়েকবার হয়ে গেছে।

দুটো রাস্তা পেরোলেই বর যাত্রীর বাসা, ওরাও এখনও এসে পৌঁছায়নি। হাসিখুশী মানুষটাও বেশ রেগে যাচ্ছেন।

রেশাদ বাস থেকে নেমে খুব চিন্তায় পড়ে গেলো। আদরের বোনের বিয়ে, সে কি দেবে? তার তো তেমন কোন কোন সঞ্চয় নেই। খায়দায় আর থাকে তো জুয়েলের পাহাড়ি বাড়ীতে। ওরা কিছু নেয় না। আর রুমা বাজারের স্কুলে পড়িয়ে সামান্য যে ক' টাকা যাও পাওয়া যায় বান্দারবানে মসে দু'একবার এলেই তাও শেষ । এসব ভাবতে ভাবতে একটা রিকশায় চড়ে জুয়েলের ঢাকার বাড়ীতে গিয়ে উঠল। কোয়ার্টার পেয়েছে জুয়েল। ছুটির দিন ডাক্তার সাহেবকে বাড়ীতেই পাওয়া গেলো।

বন্ধু জানতো না তার আসার খবর। খুব অবাক হলো।

এতদিন পরে, তাও কোন বলা কওয়া নেই।

তা এক বছরের বেশী তো হবেই। সেই সে কবে একদিনের জন্য এসেছিলি। জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছিস। কত সম্ভাবনার একটা জীবন তোর...

উল্টো যদি আমি বলি তুই তোর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছিস। তোর সেই নিজ এলাকার মানুষ এখনও নুন্যতম কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। তারা বিনা চিকিৎসায় ধুকেধুকে মরছে। এখনও অদৃশ্য শত্রু ঝড়ের রাতে নারী শিকার করে চলেছে। আর তুই এত শিক্ষা দীক্ষা আর ডাক্তার হয়ে এই ইট পাথরের দেয়ালে বন্দী হয়ে জীবন নষ্ট করছিস। তোর কি ঐ পাহাড়ের প্রতি কোন দায়িত্ব ছিল না?

মনতো চায়, বাস্তবতা তো সাপোর্ট করে নারে। বিয়ে শাদি করে ওদের নিয়ে ঐ পাহাড়ি এলাকা এখন আর সম্ভব নয়।

তাইলে বোঝ তুই তোর মনের ইচ্ছে মত কাজ করতে পারিসনে। আমি পারছি। মনের সাধ মিটিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। যতটুকু সাধ্য ঐ পাহাড়ী লোকগুলোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাদ দেতো ওসব। আসলে আমরা সবাই হিপোক্রেট। নিজের কাজের পেছনে একটা যুক্তি খুঁজি কেবল। ভেতরে ভেতরে নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ কার মনে না চলছে।

মনের সাধ? সৃজয়াকে ছাড়াই? সরি দোস্ত, তা তুই কি কাজে বলতো? কাজ ছাড়া নিশ্চয় আসিস নাই।

কাজ তো বটেই। রুমকীটার বিয়ে আজকে। তোকে একটু হেল্প করতে হবে। কিছু টাকা দিতে হবে, ধার মনে করেই। আমার কাছে বেশী নেই। পরে ধীরে ধীরে দিয়ে দেবো। আদরের বোন। কিছু তো একটা দিতে হবে? কি দেয়া যায় বলতো ?

ধারের কথা বলছিস! তুই আমার পরিবারের সব দেখাশোনা করছিস আর তোর জন্য আমি কিছু করতে পারি না। শোন আমার এক খাস রোগীর স্বর্ণের দোকান আছে। ঐ ব্যাটা আমার এতই ভক্ত, টাকা না দিলেও সে দোকান থেকে যা প্রয়োজন নির্দ্বিধায় দিয়ে দেবে। তার বউটাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সথে বাচ্চাটাও। কোথাকার কোন ভন্ড বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল বউটাকে। বউয়ের হৈছিল একলেমশিয়া। আমার সাথে ভাগ্যক্রমে দেখা। ভাগ্যক্রমটাও দেখ, আমার গাড়ীর সাথে ধাক্কা খেল ব্যাটা আর তার বউ। পীরের মাজারের দিকে তাকিয়ে পেছনের দিকে হেঁটে বার হচ্ছিল। বল কি কঠিন অবস্থা। আমার ড্রাইভারতো ভয়ে শেষ। শেষে আমি দুজনকে গাড়ীতে উঠিয়ে হাসপাতলে নিয়ে আসি। লোকটার বউটার তখন যায় যায় অবস্থা। সব বুঝিয়ে বললাম দুজনকে। লোকটা তো বুঝতেই চায় না। শেষে চিকিৎসা করে যখন বাচ্চা আর মা দুজন সুস্থ হলো তখন তার ভুল ভাঙল। এত টাকা, এত বড় ব্যবসা অথচ পর্দা নষ্ট হবে তাই গর্ভবতী বউকে মায়ের নিষেধে ডাক্তার এর কাছে নেবেনা। কি অসভ্যতা এখনও চিন্তা কর। টাকা দিয়ে সভ্যতা আসেনা , সভ্যতা আসে শিক্ষায়।

তাইতো তোর ঐ পাহাড়টাকে শিক্ষিত করার চেষ্টায় নেমেছি রে।

আচ্ছা, তারপরও স্বীকার করবি না তুই পালিয়েছিস।

কথা তো মানছি, সত্যি পালিয়েছি তো। এত আকর্ষন পিছু টেনে রাখে । সে সব থেকে না পালালে বিশেষ কাজ কি করা যায়। হয়তো পলায়নটাও কারও জন্য সৌভাগ্য!

তোর সাথে কি পারা যায় রে। হার মানলাম। ঠিক আছে। আগে খেয়ে দেয়ে নে, তারপর চল, ঐ লোকের দোকান থেবে একটা স্বর্ণের হার কিনে দিচ্ছি। রুমকীকে দিস। ফ্রি নেবো না। টাকা দিয়েই নেব। আর টাকা ধারের কোন কথা নেই। আমি টাকা কম কামইনা। তুই যে আমাদের পাহাড়ী এলাকাটার দেখ ভাল করিছ এটা তার সামন্য পুরষ্কার মনে করে নিবি।

সমস্যা এটাই নিঃসঙ্গ জীবনে। নিজের জন্য কোন সমস্যা নেই। সমাজের মাঝে এলেই এই বিপত্তি। ওকে তোর থেকে নিতে আমার কোন সমস্যা নেই। তুই বদলাস নি। ভাল লাগল। কিন্তু রুমকী তোকে বিয়ের কথা বলে নি। আশ্চর্য । চল রেডি হ, তুই আমার সাথে যাবি।

থাক না। তুই নেই আর আমি কি করে ওদের ...

কোন কথা না। আমি তো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না। যতটুকু আমার দৌড়াত্ম ততটুকুতেই তুই থাকবি না হয়।

স্বর্ণের দোকান থেকে বের হয়ে রুমকীর মোবাইলে ফোন দিল রেশাদ।

কোথায় তোরা ?

ওহ! ভাইয়া! আমি শিকমী। তুমি আসছ। কোথায় ?

তোরা কোথায় ?

আমি আর আপি পার্লারে এসেছি। ধানমন্ডিতে।

কতক্ষণ লাগবে, লাগবে মনে হয় ঘন্টাখানেক। মাত্র সিরিয়াল পেয়েছে। ওদিকে বাবা প্রতি ১০ মিনিটে একবার ফোন দিয়ে যাচ্ছেন।

ঠিক আছে। থাকিস। আমি এক্ষুণি আসছি।

ফোন রেখে রওয়ানা দিলো রেশাদ তার ডাক্তার বম বন্ধুটির গাড়ীতে।

তার মানে, তুই পার্লার থেকে দেখা করেই চলে যাবি।

আর কি করার। বাবাকে তো চিনি। খুব হাসিখুশী মনে মেয়ের বিয়ের আনন্দ করছে নিশ্চয়। আমাকে দেখে তার সেই হাসিখুশি নষ্ট কেনো করবো?

ভাইয়া, তোমাকে পুরো রবীনসন ক্রুসোর মত লাগছে।

ঐ ব্যাটাকে তুই আবার কোথায় দেখলি?

ভাইয়া, সিনেমায় দেখেছি তো। ভাইয়া তোমার কি আমাদের জন্য একটুও মায়া লাগে না।

রুমকীর হয়েছে? না এখনও সাজছে?

হয় নি বোধহয়। হয়ে যাবে। বসো। দেখে আসি। আমার কথার উত্তর দিলে না যে ভাইয়া।

কি বলব রে। তুই তো অনেক বুঝিস। আমি যে এখন বেমানান হয়ে গেছি। আমাকে ছাড়াই বরং এইসমাজ, তোরা ভাল আছিস?

রুমকীকে বের হয়ে আসতে দেখা গেলো। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল রেশাদকে।

এখনই মাত্র সং সাজলি, চোখে জল আনলে সব ভেস্তে যাবে।

যাক, লক্ষী ভাইয়ের জন্য একটু নষ্ট না হয় হলোই। জুয়েল ভাইয়া যে! ভাল আছেন। ছিঃ , কি লজ্জা! শিমকী তোদের দাওয়াতের লিষ্টে ওনার নাম আসে নি কেনো? আসলে আমারই মনে করিয়ে দেয়ার কথা ছিল। ভাইয়া এখন দাওয়াত দিলাম। প্লিজ চলুন।

অসুবিধা নেই। তোমার ভাইয়াকে নিয়েই তো আমি। সেই নেই আর আমি। তা তোমার ইন্টারনি শেষ হয়েছে তো?

হ্যাঁ প্রায় শেষ। ডাক্তারী আজ থাক ভাইয়া। এখন আপনি আর ভাইয়া দুজনেই আমাদেও সাথে যাচ্ছেন।

না, থাক রুকমী। এই তো দেখা হলো। ওখানে গিয়ে শুধু শুধু একটা ঝামেলা করার কি দরকার। শুভ কাজে অমঙ্গল হবে তো।

ভাইয়া তুমি না গেলে আমি কবুল বলবো না।

চুপ, তা হয় না। আমারে আবারও দোষী বানাবি? পরে আসব আরেকদিন।

মা খুব কাঁদে, ঝড়ের দিন থেকে সেটা আরও বেড়েছে। একটা খবরও তো দিতে পারো। মা কি তোমার পর?

কেউ আমার পর নারে। আমিই এই সমাজের পর।

শিকমী মোবাইলটা এগিয়ে দিল রুমকীর দিকে, এই যে বাবা আবার ফোন দিয়েছেন।

আমার কথা বলিসনা, বাবা হয়তো সহজে ভাবে নিতে পারবে না।

ফোনটা রিসিভ করল রুকমী, এইতো বাবা আমরা গাড়ীতে উঠেছি। আসছি।

বর পক্ষ রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি আয়।

ওদের বাড়ী থেকে কতদূর আর আপু! দাড়াও সায়ানকে একটা ফোন দিয়ে বলি ১৫ মিনিট পরে রওয়ানা দিতে।

সায়নাকে ফোন দিল শিমকী, আপনার নাকি রওয়ানা দিয়ে দিয়েছেন। শোনেন বধূর এখনও সাজা হয় নি।

আপনি করে বলছ কেনো?

বোঝেন না কেনো? চিন্তা করে দেখেন।

নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নাকি?

রাখছি। ১৫ মিনিট পরে কিন্তু...

কিরে শিমকী সায়ানের সাথে এইভাবে কথা বলছিস কেনো।

ও তুমি বুঝবে না আপু।

তা ভাইয়া তোমরা দুজনই আমাদের সাথে যাচ্ছ তাহলে।

কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার, আমি সেন্টারে যাবোনা। মা তো বললি এখনও বাসায়অ। তা ভালোই হলো। আমি বাসার নিজ পর্যন্ত যেতে পরি। চুপ! বাবার সামনে পড়া যাবে না। শিমকী বাসায় গিয়ে মাকে খবর দিবি । মার সাথে দেখা করলে তো তুই খুশী।

কিন্তু খাবে না।

চুপ রুমকী, আজ তো বিয়ে আমি চাই না কোন ঝামেলা হোক। নিশ্চয় সৃজয়াদের নিমন্ত্রন দেয়া হয়েছে। তুই চাস-অকারণ একটা ঝামেলা বাঁধুক। তোর নতুন জীবনের শুরু আজ। শুরুটা ভাল হোক।

বাসার সামনে থামল দুটো গাড়ী। একটাতে রুমকী আর শিমকী । এটা রুমকীর বড় চাচার গাড়ী। আরেকটাতে জুয়েল বম আর রেশাদ। এটা ডাক্তার জুয়েলের গাড়ী।

ভাইয়া, মা নিচে আসবে তার চেয়ে তুমি উপরে চল না। বাবাতো নেই। প্লিজ ।

দু'বোনের করজোর অনুরোধ না রেখে পারলনা। সিড়ি ভাঙতে শুর করল অবশেষে রেশাদ আর জুয়েল।

দরজাটা মা খুললেন। বাসায় এখন মা আর কাজের মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে সেন্টারে। মা দরজা খুলেই বলে উঠলেন, কিরে তোরা আবার এখানে এলি কেনো। আমিই তো বের হচ্ছিলাম, চল চল, আড়াইটা বেজে গেছে। বর পক্ষ চলে এসেছে বোধহয়। কথা গুলো এক নিশ্বাসে বলার পর মার চোখে ধরা পরল তার প্রিয় পুত্রের চেহারাটা। মুখ ভর্তি দাড়ি। ফর্সা মুখটার অবশিষ্টাংশ আগের চেয়ে যেন আরও ফর্সা দেখাচ্ছে।

মার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আয় আয়। ভেতরে আয়। এস জুয়েল , ভেতরে এস। ভাল আছ বাবা। একটু খোঁজও তো নেও না এই মরা আন্টিটার?

ভেতরে গিয়ে বসলো সবাই। নিজ গৃহে আজ পরবাসী রেশাদ। কেমন অদ্ভূত একটা ব্যাপার।

আমার আর জুয়েলের পক্ষ থেকে রুমকী জন্য এই হারটা...

জানি বড় ভাই হিসেবে আমি কিছুই করতে পারিনি...

রেশাদের মুখের উপর হাতটা চেপে ধরে রুমকী বলল, চুপ ভাইয়া! এটা আমার বিয়ের সব থেকে সেরা উপহার।

মা একটু ভেতরে গিয়েছিলেন। চোখটা একটু ভালকরে মুছে এলেন। বললেন, চল সবাই একসাথেই যাই।

না মা! বাবার সামনে গিয়ে সব পন্ড করার কি দরকার। এমনেতেই আমার অনেক দোষ ।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এতদিন পর... ওনার ও তো মন আছে। দেখিস উনিও মেনে নেবেন।

কিন্তু যদি না মেনে নেন। তখন। কি দরকার। আমরা তো কেউ নিশ্চিত নই। আর সৃজয়ারাও নিশ্চয় ওখানে...

তাও ঠিক। তাইলে রুমমী তোরা দু'বোনে চলে যা। না হলে ওদিকে তোদের বাবা আবার হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসবে। কিন্তু ওদের দুজনের খাওয়া দাওয়া কি হবে?

থাক না মা। ওসব হাবিজাবি পেটে সইবে না আজ আর। বাসায় যা আছে দাও খেয়ে চলে যাই।

ভাইকে জড়িয়ে ধরে দুমিনিট নিরবে কাঁদল রুমকী। পানি ছাড়া সে অদ্ভুত কান্নাতেও মেয়েরা সমান পারদর্শী।

বোনের মাথায় হাত রেখে শুধু বলল রেশাদ, সুখী হ বোন। যা বিয়েটা করেই ফেল।

দু'বোন চলে যাবার কিছুক্ষণ পর একটা রিকশা এসে থামল সিঁড়ি গোড়ায়। রুগ্ন একজন নারী নামলো রিকশা থেকে। দেখে বোঝা যায এই রুগ্ন নারী একদা অপূর্ব সুন্দরী তরুণী ছিল। বয়স এখনও যদিও তিরিশই পার হয়নি হয় নি তবুও বয়সের মিথ্যে ছাপ ভর করেছে শরীরে। ছিপছিপে সেই ভগ্নপ্রায় দেহে তবু সে অপস্বরী আজও কম না।

ঘটনাটা দৈবাৎ হতে পারে। নাও পারে। কিন্তু ঘটে গেছে।

রেশাদ যখন গাড়ী থেকে নামছিল। ঠিক তখন ডানে পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী যাচ্ছিল। গন্তব্য বিয়ের অনুষ্ঠান। গাড়ীটিতে বসে থাকা ঐ অস্তগামী সৌন্দর্যের সাঁঝ বেলায় নেমে আসা রূপের অধিকারিনী রুমকীদের বাড়ীর দিকে তাকাচ্ছিল। অতি চেনা বাড়ীটা। চোখ তো পড়বেই এবং সেই দু'চোখে রেশাদ কে চিনতে একটুও ভুল করার কথা না, করেও নি।

বিয়ে বাড়ীতে স্বামী আর বাবা মাকে রেখে তাই একটা রিকশা নিয়ে অচেনা কোন কারনে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই চলে এল দ্রুত ও বাসায়।

মায়ে হাতের রান্না করা ডিম ভাজি আর ডাল দিয়ে মাত্র খাওয়াটা শুরু করেছে রেশাদ আর পিটার ।

কলিংবেলটা বাজল সেই সময়। আবার কে এল। মার বুকটা একটু কাঁপলো। কিন্তু কেনো কাঁপবে। নিজের আপন ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন তিনি। কার কি বলার আছে। ভাবতে ভাবতে দরজাটা খুললেন।

আরে সৃজয়া! মামণি, তুমি, সেন্টারে যাওনি। একা এসেছো?

না, আন্টি মা, সবাই মিলেই এসেছি। বাকীরা ওখানে আছে। আমি এসেছি...আমি এসেছি... রেশাদকে দেখলাম গাড়ী থেকে নামতে, তাই এসেছি আন্টি মা।

কিন্তু তোমার ওর কাছে কি প্রয়োজন মা? আর এ কি অবস্থা, তোমার শরীরের এত করুন হাল , কেনো ? কোনো অসুখ টসুখ...? কি চেহারা কি হয়ে গেছে।

সব বলছি। ভেতরে আসতে বলবেন না আন্টি। বলুননা ও কোথায় ?

এস, ওরা খাচ্ছে।

এখানে খাচ্ছে, কি আশ্চর্য, ওখানে...বুঝেছি, সব আমার দোষে, সব আমার দোষেই তো আন্টি মা। এত দোষ আমার দেহ সইবে কেমন করে বলুন।

খাওয়া বাদ দিয়ে হা করে তাকিয়ে আছে সৃজয়ার দিকে রেশাদ। কি চেহারা হয়েছে মেয়েটার, মন আপনাতেই ভেবে কষ্ট সাগরে কয়েকটা ডুব দিযে নিলো। তারপর না দেখার ভান করে খাওয়ায় মনেযোগ দিল আবার। খুব স্বাভাবিক তাকে থাকতেই হবে। অভিনয় হলেও। এ চিন্তা সে আগেই করে রেখেছে। কোনদিন এই মেয়েটার সামনা সামনি হলে খুব স্বাভাবিক আচরণ সে করবেই। খুব বেশী স্বাভাবিক। অথচ ও জানে খুব স্বাভাবিক মানেই এক ধরনের অস্বাভাবিকতা। কিন্তু কি উপায়।

মা আবার রান্না ঘরে দৌড়ালেন। ছেলেদুটোকে কি খাওয়াবেন সেই চিন্তায় হাতের কাছে যা পেয়েছেনে ফ্রিজে সব গরম টরম করতে ব্যস্ত।

মা, আর কিছু লাগবে না। প্লিজ। কাল বিকেলে চলে যাব। পারলে আরেকবার দেখা করে যাব। যদিও দেখো যে কারনে আমি চলে যেতে যাচ্ছিলাম সেই সব কারন আমার পিছ কি ছাড়ছে? নিশ্চয় ওদের দুজনের কেউ খবর দিয়েছে। মেয়ে দুটো না!

না রেশাদ, তোমার বোনেরা কেউ আমাকে বলে নি। আমার ভাগ্য। মহা সৌভাগ্য। তোমাকে আমি গাড়ী থেকে নামতে দেখে ফেলেছি। রাগ করো না। আমি শুধু বলতে এসেছি, আর কত, অনেক তো হলো, এবার স্বাভাবিক হও। ফিরে এস। বিনা দোষে কেনো শাস্তি ভোগ করছ?

রেশাদ এসব কথা নিয়ে কিছু বলতে চাইছে না। তাই অন্যদিকে কথা ঘুরাতে বলে উঠল, তোমার ছেলে না মেয়ে হয়েছিল? আমি কিন্তু ঠিক জানি না। সাথে এনেছো, একটু দেখতাম। তোমার স্বামী নিশ্চয় খুব আদর করে তাকে। নিজের সন্তান বলে কথা। কি নাম রেখেছো।

তুমি জানো না? আসলেই তো। আমার কোন খোঁজ কি তুমি নিতে চেয়েছো! একবারও ভেবেছ আমি কেমন আছি। ওরা তো সবাই ওটা তোমার সন্তান মেনে নিয়েছিল। প্রমাণ দেবার আগেই সেই সন্তানকে পৃথিবীর আলোর আড়ালে হত্যা করা করা হয়েছিল। হত্যাকারীরা সকলে ছিল ভীষন খুশি। হত্যার আনন্দে মাতোয়ারা ছিল সকলে। সে আনন্দ ছলেই আমাকেও মাফ করে দেয়া হলো। হত্যা কখনই মানুষকে অখুশি করে না কেনো বলতে পার? ওরা খুশি হয়েছিল তোমার মত নিরীহ একজনকে সব দোষের অংশীদার বানিয়ে। দেখো ক'জনাই সত্যটা বিশ্বাসের চেষ্টা করেছে। আর তুমি তো নিরবে অভিমান করে পালিয়ে গেলে। যেন ভান করলে সব মেনে নেয়ার ।

আমি রুমকীকে বলে গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে। বলেছিলাম, তুমি যেন পরীক্ষা করে সবার মুখ বন্ধ করে দিতে পার।

সেই সুযোগ আমাকে কে দিল বল?

রেশাদের মা দূর থেকে শুনছিলেন। বললেন, মা আমাকে একবার ফোন করে বলতে পারতে।

সবই অদৃষ্ট আন্টি মা। বাবা-মা বিশ্বাস করেনি। নিজের স্বামীও বিশ্বাস করল না। তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে মাত্র দুবার সন্তান ধারনের মত অবস্থায় ছিলাম। আমি তো জানি সেই দুদিনের একদিনই যথেষ্ট ছিল। ও মানতে চায়নি।

তুমি দাঁড়িয়ে কেনো, বস না। খাবে? মায়ের হাতের সেই অসাধারণ খাবার। তুমি এসেই মাকে বলতে আন্টি আপনার হাতের আলু ভর্তা আর ডিম ভাজি না খেয়ে যাবই না।

তোমার সব মনে আছে , দেখেছো রেশাদ।

জুয়েল বলল, তারপরও ভাবী ওই লোকটার ঘর করে গেলেন..করছেন। ভাবী বলায় রাগ করেন না আবার। পুরানো অভ্যাস তো...

না, কার উপর কেনো রাগ...ঘর না করে কি করব, কোথায় যাব? চারপাশটা যে সেটাই চায়। তাদের খুশী সেখানেই।

তারপর আর কোন সন্তান? তোমার স্বামীর নিজের একান্ত বিশ্বাসের নিজস্ব ফসল...

রেশাদের প্রশ্ন শুনে চমকালো সৃজয়া।

সন্তান! পশুর শিকারে পরিণতা হওয়া যায় কিন্তু তার সন্তানকে ধারণ করা যায়না।

মা এগিয়ে এসে সৃজয়ার চোখ দুটো মুছে দিতে দিতে বললেন, মা সব ছেড়ে তোমরা আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে পার না। তুমি আর রেশাদ। আমি মেনে নেব। সবাইকে বলব...

রেশাদের খাওয়া শেষ ততক্ষণে। মা ওসব বলে কেনো উপহাস করছ। বাদ দাও। যাও বিয়েতে যাও। তোমার জন্য আবার কিছু আটকে থাকে কিনা দেখো। আমি চললাম। তুমি বিয়েতে যাও আগে। বাবা রাগ করবেন।

তুমি ফিরে এস, আমার জন্য না, তোমার মার জন্য এস।

সৃজয়া, চুপ। কোন কথা নয়। প্লিজ। নতুন কোন ঝামেলা নয়। আজ রুমকীর বিয়ে। এটাই মুখ্য। তুমি যাও। অনুষ্ঠানের ওখানে যাও। মা, চললাম। ওকে সাথে করে নিয়ে যাও।

দ্রুত বের না হয়ে গেলে চোখের কোনের জলটা মার থেকে এড়াতেই পারত না রেশাদ।

ঘরোয়া আয়োজনটি শেষমেষ ঘরোয়াই যখন আর থাকে নি, মাঠ অবধি গড়িয়েই গেলো, সাদামাটা বিয়ে আর কেনো হবে। বিয়ের ষোল কলা পূর্ণ করার প্রচেষ্টায় উৎসবের মুখরতায় ভরে উঠল অনুষ্ঠান। বরের ভাগ্নে আর কনের মাঝে মজার পর্ব আয়োজনের উদ্যেগে বাড়তী উচ্ছ্বাস ছিল। হবেই তো ভবিষ্যতের স্বপ্নচারী প্রেমিক যুগল তারা। মামা আর বোনের বিয়েতে দুধের মাঝে আংটি খুঁজে বেড়ানো ধরনের সুলভ আর সরল আনন্দ উদ্রেককারী অনুষ্ঠানের মাঝে তারাই তো নিজেদের প্রেমের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিল। মজায় আর মজায় কেটে গেলো সারাটা বিকেল।

এ রাস্তা পেরিয়ে ঐ রাস্তা । তবুও কান্নার রোল পড়ে গেলো। ওটুকু ছাড়া যেন বিয়ে সম্পন্নই হয় না। এত আনন্দ যে বিয়েকে ঘিরে তারই শেষটুকু কান্না না হলে শাপ মুক্ত হয় না যেন। মা মেয়ের চোখের জলে আলাদা একটা ব্যাঞ্জনা ছিল, সে কান্নায় কেবল দুজনার বিচ্ছেদ বিরহ টুকুই নয়, সেখানে রেশাদের অস্তিত্বও অমাবশ্যার চাঁদের মত সত্য কিন্তু লুকানো। শিমকীর মত দূর্দান্ত মেয়েটাও চোখের জল ফেলে দিল। সায়ান সে দৃশ্যটাকে আবার ক্যামেরা বন্দী করতে একটুও ভুল করল না।

রুমকীদের বাসায় ধীরে ধীরে নিরবতা নেবে আসছে। নিকট আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারা অনেকেই বাসায় হাজির হয়েছিল সেন্টার থেকে। সৃজয়া তার স্বামীর সাথে চলে গেলেও বাসায় এসেছিল সৃজয়ার বাবা মা।

রেশাদেও মাকে তিনি একটা উটকো ধন্যবাদ দিতে এসেছিলেন। কিছু লোক থাকে এই সমাজে সবসময় যারা আগুনে ঘি দিয়ে উসকানী দিয়ে কোন অজ্ঞাত অপআনন্দ খোঁজার চেষ্টা করে। কারন তারা আসলে নিজেরা আনন্দবিহীন। সৃজয়ার বাবা মা সেই ধরনেরই।

সৃজয়ার মা তাই হয়তো বললেন, ভাবী রেশাদ না এসে খুব ভাল করেছে। আমার মেয়ের সংসার টাকে তো অশান্তি দিয়ে ভরিয়েই দিয়েছে, মেয়েকে আমার আজবিনের জন্য ও বাড়ীতে মাথা হেট করে থাকতে হচ্ছে।

তবুও ওরা অনেক ভাল বলেই আপনার ছেলের সাথে এমন অপকর্মের পরও ছেড়ে তো দেইনি। আর দেখেন মেয়েটা এমনই ত্যাদড়, আজও বাচ্চা নিল না। সেবার কনসিভ করলো , চিন্তা করল না বাঁচবে না মরবে, গোপনে অ্যাবরশন করালো। দেখেছেন শরীরের কি অবস্থা। কি চেহারা ওর কি হয়ে গেছে। ওমন ছেলে আপনারা ত্যাগ করেছেন, খুব ভাল করেছেন। নিজেতো পঁচেছে আমার মেয়েটাকেও জাদু করে রেখে গেছে।

আপনারা ভুল করছেন। আপনাদের জানা ভুল ছিল। আমার ছেলে কোন দোষ করেনি । করেনি আপনার মেয়েও। সব আপনাদের ভুল।

রুমকীর বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কি করে জানলে। তোমার ছেলের স্বেচ্ছা নির্বাসন কি প্রমাণ করে না...

না তুমি, তোমরা সত্যি জানো না। ভাবী? আপনার মেয়ে একটা মৃত লাশ হয়ে বেঁচে আছে। আপনি মা হয়ে বোঝেন না কেনো? ছিঃ। একটু চোখটা খুলুন। আর কত। মেয়েটাকে তো জলে ভাসিয়েই দিয়েছেন। এবার একটু তীরে টানুন। আপনি তো মা, আপনি বুঝেন না মেয়ের দুঃখ। এখনও কি সম্ভব নয়, ওদের জীবনগুলো সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেয়ার...

ভাবী চললাম। আসলে আমাদের আসাই ঠিক হয়নি। এত অপমান। চলি। ভাল থাকবেন।

চলে গেলো সৃজয়ার মা বাবা। রুমকীর বাবা চুপ করেই থাকলেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করছেন তার স্ত্রীর এই উচ্চবাক্যের কারন।

মেয়েটা কনে সেজে চলে গেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঐ বাড়ীটা। ওখানে এখন রুমকী। সেদিকে তাকিয়ে আছেন রুমকীর মা। পাশের ঘর থেকে তার স্বামী পুরষটি বললেন, নামাজ পড়েছ ... সময় চলে যাচ্ছে তো। দোয়া কর, দোয়া কর, মেয়ের বাড়ী এখন ওটাই। তাকিয়ে কি হবে গো। তিনি কি আর জানেন, পথ চোখের সামনে একটা থাকলেও দৃষ্টি চলে যায় কত দূর, কখনও কত অজানায়, যেখানে হারিয়ে যায় মনের গহীনের কেউ। কোথায় আছে রেশাদ? কাল কি সত্যি আর একবার আসবে? কোথায় দেখা হবে? মার মন কিছুতেই কি মানানো যায়? মার মন বলেই আরও একটু বেশী বেশী ভাবতে থাকেই। সৃজয়া না এলেই বোধহয় ভাল হত। শুধু শুধু তার ছেলেটা বাড়তি যন্ত্রনার আর এক স্তর মনে চাপিয়ে নিয়ে গেলো। কি মেয়ে, কি প্রানচঞ্চল ছিল। যখন এ বাড়ীতে রেশাদের সাথে আসত, মাতিয়ে রাখত। ছোট ছোট ঘটনা কি ভয়াবহ মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

নামায পড়েছি, চা খাবে? রুকমী নেই, কে তোমাকে চা খাওয়াবে? বলে জানালা থেকে চোখ সরিয়ে রান্নার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

শিমকী নাইওরী হয়ে ও বাড়ীতে থাকতে গেছে । আসল উদ্দেশ্য সায়ান। না হলে এত কাছে আবার সাথে কেউ আসে নাকি, তাও যেখানে সায়মার মত বান্ধবী আছে।

নতুন বউ। বাড়ীতে খুব ভীড় ছিল এতক্ষণ। আত্মীয় স্বজনের গমগম করছিল। রুমকীর রূপ দেখে মুগ্ধ সকল আত্মীয় স্বজন। তার উপর ডাক্তার মেয়ে, সবার মুখে হাসির রেশ। ধীরে ধীরে যে যার মত উপদেশ, নির্দেশ কিংবা সরল উক্তি ছুড়ে বিদেয় নিলো।

রাত ন'টা বাজে। শাহেদের বন্ধুরা ক'জনাও আড্ডা দিয়ে চলে গেলো। শাহেদের বাসর ঘরটি বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সেখানে এখন দুই ডাক্তার বান্ধবী নতুন সম্পর্কের তানপুরায় নতুন সুর তুলছে, আনন্দের সুর। দুটো রুম পরেই সায়মার রুম। সাথে লাগোয়া যে বরান্দা সেটা একটু নিরালায়, একটু সরু। সেখানে দুটি মূর্তিকে খুব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়েছে। তারা ঐ পরিবেশ সবচেয়ে নব্য প্রেমযুগল। ছেলেটা মেয়েটাকে বলছে, তাহলে তুমি আজ থেকে সম্পর্কে আমার খালা হয়ে গেলে...

তারপরই বারান্দা হতে চারটি চোখ নিচে চলে গেলো। বাড়ীর সামনে এসে থামল এক টি পুলিশের জিপ। বেশ কজন কনেষ্টবল সহ একজন পুলিশ অফিসার নামলেন সেখান থেকে। সোজা উঠে এলেন তিন তলায় সায়ানদের বাড়ীতে। পুলিশের অফিসার বাস করে যে বাড়ীতে সেখানে পুলিশ এর গাড়ী আর ব্যাটেলিয়ান দেখে কারও কোন সন্দেহ না হবারই কথা। তবুও চারটি চোখ তাকাল। ওদের মনে কোন এক অজানা সংশয় তুচ্ছ শব্দকেও পাত্তা দেবে এই লুকোচুরি প্রেম মুহূর্তে সেটাই স্বাভাবিক। ওরা নব্য প্রেমিক, অজ্ঞাত কাঁচা প্রেম।

গৃহসহায়িকা মেয়েটা দরজা খুলে দিতেই অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, শাহেদ সাহেব আছেন। ওনাকে ডাকুন।

শাহেদ সে কণ্ঠ শুনে নিজেই উঠে আসল। চিনল। তার জুনিয়ার ব্যাচের এ এসপি, জুনায়েদ।

আরে তুমি। কোন সমস্যা?

না শাহেদ ভাই। আমি খুবই দু:খিত, আমি জানি আজ আপনার বিয়ের রাত। কিন্তু আমার কাছে আপনার নামে গ্রেফতারি পরওয়ানা আছে। উপরের আদেশ। অপরাধটা প্রকৃত কি সে আপনিই আমার চেয়ে ভাল জানবেন তবে এতটুকু বলতে পারি কাগজে কলমে অন্তত মারাত্মক। লোকট মরেও যেতে পারে। এখনও প্রাণ আছে । এত রাগ কেনো যে দেখান। আই এম সরি। আপনাকে আমার সাথে যেতেই হচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক রিমান্ড, আইনের অপব্যবহার আর নিরহ একজন কে টর্চারের নামে অ্যাটেম টু মার্ডারের চার্জ দাখিল করা হয়েছে। আমি নিরুপায়।

শাহেদ মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে গেলো।

ওকে, তোমারা বস। মিষ্টি টিষ্টি খাও। আমি বিদায় নিয়ে আসছি। আজগর মিয়া সত্যি বেঁচে আছে তো?

এখনও আছে। হাসপাতালে অজ্ঞান।

শাহেদ বুঝতে পারছেনা কি করবে। রুমকীর সামনে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না।

সোজা দুলাভাইয়ের কাছে গেলো। দুলাভাই, সবাইকে আপনি একটু বোঝাবেন। আমি চললাম। ও কিচ্ছু হবে না। দেখি কি করা যায়। এই যাব আর আসব।

শাহেদ গায়ের পায়জামা পাঞ্জাবীটা খুলে একটা টি শার্ট আর জিন্স পড়ে জুনিয়ার অফিসারের সাথে নিচে নেমে গেলো।

সায়ানের বাবা খুব বিহ্বল হয়ে উঠলেন। বিচলিত হলেন। কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। প্রথমে সায়মাকেই ডাকলেন। তারপর সায়মার মাকে। দুজনকেই এক সংগে জানালেন বিষয়টা।

সায়মা চেঁচিয়ে উঠল, মামা রুকমীকে বলে কেনো গেলো না? না ঠিক করলো না কাজটা। এমন কেনো ...সেই চেঁচানো কথাটুকু বাড়িতে সেই সময় থাকা অনেকের কণ্ঠেই পৌঁছালো। জানাজানি হতে সময় লাগলো না।

বারান্দার আলো আঁধারিতে বসে সায়ান শিমকীকে দুষ্টামী করে বলল, আজ আমাদেরও বাসর ঘর হয়ে গেলো কেমন হয় শিমকী? শিমকী হাত উঁচিয়ে বললো, মার খাওয়ার মত হয় ...। ওকে তাহলে একটা চুমু অন্তত। মানুষ প্রেম করে আজকল কত কিছু করছে , আর তুমি।

সময় কি শেষ হয়ে গেছে।

আই, তুমি না অজ্ঞান হয়ে গেলে ক'দিন আগে। গায়ে এত জোর কোথা থেকে আসছে। ..

আচ্ছা একটা, শুধু একটা ...

চিন্তা করতে হবে।

তারপরই শিমকী বলে উঠল, সায়াম আপুর কণ্ঠ না। চল তো দেখি কি হয়েছে।

রুমকী তখনও জানে না। কেউ জানালো না। শিমকী ওদের বাড়ীতে ফোন করে মা বাবাকে জানাল বিষয়টা। বলল, বাবা কিছু একটা ব্যবস্থা কর। কি আশ্চর্য! আপিকে কি করে বলি বলো তো বাবা?

সরকারী উচ্চ পর্যায়ে শিকমীর বাবার বেশ জানাশোনা আছে। এ পোড়া দেশে পদ্ধতির চেয়ে জানা শোনার গুরুত্বই যে বেশী।

বাড়ীতে এসব আলোচনা আর কানাঘুষা থেকে রুমকীর মত বুদ্ধিমতি মেয়ের বুঝে ফেলতে দেরী হলো না। তারপর সে চুপকরে ঘর ছেড়ে বারান্দার

আঁধারে গিয়ে মুখ লুকাল। মুখের অতি রঞ্জিত মেকাপগুলো আর মেকাপ নেই। যন্ত্রনা হয়ে দাঁড়িয়েছ। ওঠানো দরকার। ঠিক হবে কিনা এই মুহূর্তে সেটা বুঝতে পারছে না রুমকী। আসলে এটা এক মানবীয় সমস্যা। খুব কমন। প্রয়োজনীয় কাজটাও কিছু কিছু সময় করা যায় না। দৃষ্টিকটু বলে শব্দটা এসে উৎপাত করে। ঘরে খাটের উপর মোবাইলটা রেখে এসেছে। ওটা তো এখন রুমকীরই বিছানা। বাজছে মোবাইল টা। দৌড়ে গেলো ধরতে। ভাইয়ার ফোন। এই এতক্ষণে মেঘ ঘন হলো রুমকীর আকাশে। অঝোরে কেঁদে ফেললো। ভাইয়াও সব শুনে খুব ভেঙে পড়ল।

দেখেছিস, আমি কত বড় অপয়া। সৃজয়ার জীবনট তো সকালেই দেখলাম, আমার জন্য , শুধু আমার কিছু সুক্ষ্ম ভূল, আর আজ আপন বোনটির ...

ভাইয়া !

না রে! কিছু মানুষ অপয়া ঠিকই থাকে।

তোমার মত মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মুখে এসব মানায় না। কিচ্ছু হবে না। একটু কান্না না আসলে নারী হবার স্বার্থকতা আর রাখলাম কোথায়। ও কিচ্ছু না।

নারে রুমকী, অপয়া হয়, কেনো হয় জানিস? প্রকৃতি কিছু মানুষের সংস্পর্শে বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ভুল করতে থাকে তখন। নিরপরাধ মানুষগুলোর তখন নাভিশ্বাস উঠে যায়। আমি ঐ রকম, ঐরকম। প্রকৃতি আমাকে দেখলে বিভ্রান্ত হয়ে আমার আশেপাশের প্রিয় মানুষগুলোর সাথে বিরূপ আচরণ শুরু করে দেয়।

উফ! কিচ্ছু হবে না তো বললাম ভাইয়া। পুলিশের বউ হয়েছি। এসব জেল হাজত তো মেনে নিতেই হবে। আর আমি জানি শাহেদ নির্দোষ। অন্যায় করা হয়েছে ওর সাথে। এটা ওর সততার পুরষ্কার। আমার তো তার বউ হিসেবে হাসি মুখে মেনে নেয়া উচিৎ। আমি বিচলিত নই একটুও।

দরজার ওপাশ থেকে সায়মা সে সব শুনে ফেলে। ঘুরে ঢুকে স্বান্তনা দেয়া চেষ্টা করল।

রুমকী বলল, না প্লিজ তুই ওদিকে সামলা। আমি ভাল আছি। বেশ আছি।

ভাইয়া, কাল চলে যেও না। তুমি থাকলে...

আমি কারও কথা শুনেছি কোন দিন। শুনিনি। তাইলে আর বলিস না। আমি জানি আমার কি করতে হবে।

তুই ঠান্ডা মাথায় শুয়ে পর। বাসর রাত এক দু'দিন পরে হলেও কোন সমস্যা নেই । নাকি আছে?

ভাইয়া, চুপ। যেও না।

না, আমি সকালেই যাব। মাকে সামলাস।

শাহেদ গ্রেফতার হবার পর ঘন্টাখানেক পেরিয়ে গেছে। রুমকীর বাবা মা সায়ান দের বাড়ীতে চলে এসেছেন। মেয়ের দিকে চেয়ে তাদের দু'জনার মন শুকিয়ে গেলো শুকনো পাতার মত মুহূর্তে। খুব কষ্ট করে তারা যে উৎকণ্ঠা লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটার প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ার আভাস পেলেন মনের পুরোটা অংশে।

রুমকীও পারল না। সামলাতে পারল না মাকে। নিজেকে তো নয়ই। বারান্দায় অনেকক্ষণ নিচের রিকশার টুংটাং আওয়াজ শুনতে শুনতে খুব কান্না পাচ্ছিল। কাঁদবে বাসরের অভাবে, তা কি হয়। ও তো ঠুনকো, সময়ের ফের। আবার আসবে। কিন্তু মুক্তি বিলম্ব মানে ভয়ের কাছে মনটা পরাজিত। একটু আগে এর মধ্যে আবার বড় ভাসুর ছুটে এসেছিলেন। বিয়ে থেকে ফিরে কাপড়টা পাল্টে বসেছেন মাত্র। খবর শুনে বেচারা বড় বোনের বাসায় ছুটে এলেন। প্রেসটিস ইস্যু । মুক্ত করাতেই হয় ছোট ভাইটাকে। অথচ আসতে আসতে তার মত প্রভাবশালী একজন সেক্রেটারীর সব চেষ্টা এক জায়গায় অকেজো হয়ে যাওয়ার কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। নিজের আসনই কেঁপে উঠতে চায়। ভয় পেয়ে যান। কি জানি কোথায় কোন শিকড়ে আঘাত দিয়েছে ছোট ভাইটি। দলীয় পরিচয় ছাড়া উপরের এসকেলেটর চলে না। ওটাতো বন্ধ করা যাবে না। বড় বোনকে তাই বুঝাচ্ছেন উনি, ধৈয্য ধর। একটু সময় লাগবে। দেখছি। আসলে শাহেদকেও একটু বুঝাতে হবে। সব কিছু কি ছেলেখেলা। এত এগ্রিসিভ হবার কি আছে। এখন বোঝ... ভাগ্যটা ভালো যে মা আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। না হলে এতক্ষণে কি অলুক্ষণে কাজটাই না হতো, ভাব একবার বুবু। ...। এসব শুনে ফেলে ভালই হয়েছে রুমকীর। ভবিষ্যতটা স্পষ্ট। মাকে তাই রুমকী একা কাছে পেতেই রেশাদের অপয়া থিউরির কথা না বলে পারলই না। এতক্ষন পর কান্নাটা একটা আলাদা মাত্রা পেলো মার আঁচলের উষ্ণতায়।

মা, ভাইয়ার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। বেচারা। শাহেদের জন্য চিন্তা করো না ও ফিরে আসবে। রাতেই আসবে দেখো। তবে আমাকে বলে গেলো না কেনো তার শাস্তি ওকে পেতে হবেই। আমি ছাড়বোনা।

রুমকীর বাবা তার পরিচিত অনেক লেভেলেই ফোন করতে শুরু করেছেন। শাহেদের বড় ভাই ফিরে গেছেন। উনি কোন কারনে ক্ষেপেছেনে শাহেদের উপর। বারবার তার মুখে এক কথা, দূর ছেলেটা বুঝলোই না, দুনিয়া এভাবে চলে না। কত কমপ্রোমাইজ করতে হয়।

কেউ কিছু বলল না। ওনাকে যেতে দিলো। অনেক জায়গায় কথা বলার পর মুরব্বী দুজন বুঝতে পারলেন বিষয়টি অনেক দূর গড়িয়েছে। আজ রাতে হয়তো কোন সমাধান হবে না।

কাল আবার শনিবার। সে আরেক সমস্যা। শেষে কিছু না করতে পেরে দু'জনে শাহেদের উর্ধ্বতন সুপারেন্টটেন্ড এর কাছে গেলেন রাতেই। তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন। উনিও অপরাগতা প্রকাশ করলেন। তবে জানালেন কিছু গোপন তথ্য। স্বংয় একজন এমপি এই গোটা ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছেন। প্রমাণ থাকার নয়। থাকে না কখনও। সবার হাত বাঁধা।

সকালে আসতে বললেন সুপারেন্টটেন্ড দু'জনকে। রাতে একবার শাহেদের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। উনি মানা করলেন। তবে আশ্বস্ত করলেন, শাহেদ ভালই আছে।

সুপারেন্টটেন্ড বললেন, যত ষড়যন্ত্রই থাকুক আমরা ওর ভাল চাই। ওর মত অফিসার অবশ্যই দরকার আছে। তবে ওরও একটা শিক্ষার দরকার ছিল। আপনারও তো একটু বুঝালেও পারেন। এ যে লোকটা আপনার ছেলেকে পয়জানাইসড করেছে , ধরা পড়েছে খুব ভালো। তাকে আইন এর হাতে ছেড়ে দাও। ওর একটু বেশী বেশী চাই...খাল থেকে নদীতে না পৌঁছালে শাহেদের হয় না। সব সময় নদীতে যাওয়া যায়না, ঢেউ আর গভীরতার ব্যাপকাতাও তো বুঝতে হবে।

ব্যর্থ হয়ে যখন পৌঢ় মানষ দু'জন ফিরে এলেন বাসায় তখন রাত বাজে একটা। রুমকীকে বাসায় নিয়ে যেতে চাইলেন তার বাবা। সায়মার বাবা বললেন, বেয়াই সাহেব এখানে আজ রাতটা না থাকলে...বুঝতে পারছি না ...তবুও রুমকীর ইচ্ছে হলে নিয়ে যান।

রুমকী গেলো না। বাবা মা বাসায় ফিরে গেলেন।

রুমকীর সাথে সায়মা, শিমকী দুজনেই থাকতে চাইলো। রুমকী সবাইকে মানা করে দিলো। বলল, এটা আমার একার বাসার ঘর। একান্ত। তোমারা কেউ এলাউড নও। দরজাটা লাগিয়ে দিলো রুমকী।

শিমকী ঘুমালো সায়মার ঘরে। সায়ান আর শিমকীর পরিকল্পনা ছিল সবাই ঘুমিয়ে গেলে দুজনে সারারাত আজ আকাশে যে অদ্ভুত চাঁদ সেটা দেখে দেখে কাটাবে। সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

কত স্বপ্ন কত পরিকল্পনা নিয়ে গত ক'টাদিন কেটেছে রুমকীর ...সব চোখের জলে ভেসে গেলো। সাদা রজনীগন্ধার মাঝে টকটকে লাল গোলাপ গুলো চেয়ে চেয়ে উপহাস করছে। নিজের রাজ্যে নিজ থানায় ও দিকে কোথায় কি করছে কে জানে শাহেদ। রক্ত গোলাপগুলো নানান কল্পনার ইতিহাসের স্তুপে গুতোগুতি করতে করতে এক সময় চোখ দুটোও বুজিয়ে দিলো রুমকীর। দু'ফোঁটা জল তখনও চোখে লেগে আছে। চাঁদটা আজ জানালা থেকে মুখই সরাবে না বোধহয়, হয়তো হিংসায় অথবা মুগ্ধতায় বিমুর্ত হয়েই।

দেখো শাহেদ, তুমি যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট এন্ড কোয়াইট একটা ছেলে। তুমি বুঝতেই পারছ অজ্ঞান পার্টির সূতো ধরে টানতে গিয়ে তুমি এমন কিছু বিষয় ইন্টাররিলেটেড করে তথ্য যোগার করে ফেলোছে যে তা অনেকের মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাঁড়িযেছে।

এই যে তোমাকে তোমার বিয়ের রাতে গ্রেফতার করা হলো। সেটাও এক ধরনের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। তোমার এটা বোঝা উচিৎ। একদিন পরেও এ কাজটি করা যেতো। তুমি বলতে পার স্যার সব জেনেও আপনি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন কেনো ।

দেখো , তোমার বিরুদ্ধে যে দুটি বড় ধরনের চার্জ দেখানো হয়েছে তাতে তোমাকে গ্রেফতার না করে উপায় ছিল না। সাসপেন্ড না করলে আমরাও কোন জবাব দিতে পারছিলাম না।

আমি শিউর তুমি হয়তো জানোই না, আজগর মিয়া নামের ব্যক্তিটি এখন হাসপাতেল মৃত্যুর মখোমুখি। চার্জে তোমারই ইনচার্জ লিখেছে, আক্রোশের বসে ঐ লোকের উপর তারই তথ্য থেকে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত পয়জান তারই শরীরে ঢুকিয়ে তুমি তাকে মারতে চেয়েছো।

কিন্তু স্যার এটা তো সত্য নয়। এতক্ষণে কথা বলল শাহেদ।

এর চেয়ে বড় আরেকটি অপরাধ ও আছে।

আর কি স্যার?

তুমি যেটা আমাকেও বলনি। আজগর মিয়া রিমান্ড মঞ্জুর করতে তুমি যে ভিওি ক্লিপের সাহায্য নিয়েছিলে, মনে আছে, সেটার পূর্ণ অংশের কপি জমা

ইতিমধ্যে আমাদের সবার কাছে পৌঁছে গেছে। এইটা সবচেয়ে কাঁচা কাজ করেছো। ঠিক খাল কেটে কুমির আনার মত। আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তুমি এই ক্ষেত্রেও অপরাধী। ফেসে গেছ ভাল ভাবেই।

ঠান্ডা মাথায় শোন , মাথা গরাম করা কিছু নেই। রক্তগরম। অনেক কিছুই করে ফেলবে ভেবেছ। খুব ভাল। কিন্তু আসলে সিস্টেম এত দূষিত, তুমি মুক্ত ভাবে বাতাস নিতেই পারবে না।

তাহলে স্যার ন্যায় বলে কিছু কি নেই। আমি দেখতে চাই অন্যায়ের হাত কত বড়।

মাথ গরম কর না। নতুন বিয়ে করেছ। সব দিকে তুমি সামাল দিতে পারবে না। তুমি আশা করি বুঝতে পারছ আমি কি বলছি। একটা ভাল পরিকল্পনা আছে। কেউ জানবে না। এটা মেনে নিতেই হবে। এছাড়া তোমাকে বাঁচানো আর উপায় নেই। আজগর মিয়া বেঁচে উঠবে ডাক্তার বলেছেন। ধীরে ধীরে অবস্থা ভাল হচ্ছে। তোমার ঐ ভিডিও সম্পর্কে সব তথ্য অপসারণ করা হবে। আমাদের কাছে ছাড়াও বাইরে এর যে কপি আছে সেটাও ধ্বংস করে ফেলা হবে। আজগার মিয়াকে পয়জন দেয়া জনিত দায় থেকেও মুক্তি দেয়া হবে। ডাক্তারী রিপোর্টে বলা হবে তোমার রাগটা বেশী ছিল, তোমার আপান ভাগ্নের কেস, আঘাত একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় আজগর আলী হার্ট এটার্ক করে। রিমান্ড টিমান্ড-ওভার লুক হয়ে যাবে। আজগর আলী কে নিয়ে আর তোমার ভাবা লাগবেনা। সে সময়টা তোমাকে সাসপেন্ড থাকতে হবে।

স্যার তারপর...

হুঁ, হুঁ, তোমার কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলোর কোন লিখিত ডকুমেন্ট তুমি রাখতে পারবে না। তুমি আমার উপর রাগ করতে পার। কিন্তু তোমার প্রতি সহানুভূতির জন্যই তোমাকে বলার দায়িত্বটা আমি নিয়েছি। আর পরিকল্পনা সবটাই আমার না , উপরের।

উপরে তো ছাদ ছাড়া কিচ্ছু দেখছি না স্যার। তা কতদিন সাসপেন্ড থাকতে হবে।

এক/দুই মাস মাত্র। নতুন বিয়ে। হানিমুনের জ্যনও একটা ভালো সময়। বেশ করে ঘুরে ফিরে কাটাবে।

নাও রিপোর্ট রেডি আছে, জবানবন্দী দিয়ে দাও। আর কিছু লাগবে না। কাল থেকে তুমি মুক্ত। কোর্টে আর কেস উঠবে না। আজগর মিয়ার হার্ট অ্যাটাক এর কারন দেখিয়ে আপাতত তোমাকে সাসপেন্ড দেখানো হবে। ফিরে এসে তোমার জায়গায় আবার তুমি। শুধু খেয়াল করবে এটা তোমার চাকুরী, তার বেশী কিছু কি আর বলব? সই কর।

কিন্তু স্যার।

নো কিন্তু। তুমি একা কিছু করতে পারবে না। খুব কঠিন। তুমি ভাল থাক, ওকে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তুমি অন্যকে ঘাটাবে তা হবে না।এ্টাই নিয়ম।

কিন্তু স্যার এর পর ফিরে এল আপনাদের প্রতি আমার সম্মান কি আর আগের মত থাকবে।

থাকবে। যদি এই টা মেনে নিতে পার, তবে আর কোন কিছু মানতে সামনে তোমার বাধবে না। এটাও ইয়াবার নেশার মত।

চিন্তা কর। দুপুর পর্যন্ত সময়। বিকালেতো তুমি জামিনে সোজা বাসায় চলে যাবে। কাল সাসপেন্ড ওর্ডার পেয়ে যাবে।

স্যার, আমি আজগর মিয়ার সাথে একটু দেখা করতে চাই।

সেটা সম্ভব নয়। নিষেধ আছে।

ঠিক আছে স্যার। একটু কথা বলা যাবে বাসায়।

ঠিক বাসায় না, তোমার বড় ভাইয়া কথা বলবেন।

ভাইয়া!

নেও, বলতে না বলতে ওনার কল এসে গেছে।

তুই কোনদিন ঠিক হবি না। এটা চাকুরী, খেলাধূলো না। ইচ্ছে মত লাফাবি নাকি। ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করে বাসরের আগেই ফেলে রেখে আসলি..

বড় ভাইয়ের এসব কথা ভাল লাগলনা শাহেদের , ঠাস করে রেখে দিল।

স্যার একটু বাসায় কথা বলতে চাই।

দরকার নেই , বিকেলে তো ফিরছই।

বিকেলে সবাইকে চমক দিয়ে বাসায় হাজির হলো শাহেদ। অফিসের গাড়ীতেই তাকে পৌঁছে দেয়া হলো। তেমন একটা কথা বললো না শাহেদ বাড়ী লোকদের সাথে। সারাটা সন্ধ্যা সে চুপচাপ থাকল। বসে রইল এক একা অনেকটাক্ষণ। ভাবনার চাদর মেলে উড়ে গেলো নমনীয় পরাজয়ের আকাশে।

আজ আবার নতুন করে বাসর সাজানো হয়েছে। প্রথম দিনের প্রানটা অবশ্য নেই সে বাসরে। আজকের গোলাপগুলো যেন শত বছরের তৃষ্ণার্ত, ভুভূক্ষু, বিমর্ষ। যদিও দেখতে ঠিকই তরতাজা উজ্জ্বল। এটাতো বাহ্যিক। ভেতরটা এই দুনিয়ায় কেই বা দেখে। অদক্ষরা দেখে কেবল। অদক্ষরা দেখলে লাভ কি?

মেঘ জমা মনটা নিয়ে বউয়ের কাঁধে মাথাটা রেখেই অঝোরে কান্না নামক বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল চোখ দুটো।

রুমকী আমি হেরে গেলাম। আজ মনে হলো আমি বড় একা, অনেক বেশী একা। সব মেনে নিলাম , কত বড় স্বার্থপর আমি ।

চুপ, এসব এখন থাক। তুমি খুব টায়ার্ড, ঘুমাও। শোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু মেনে নেয়ার মধ্যে এত কষ্ট কেনো?

কষ্ট মেনে নেয়ার মধ্যে নয়, কষ্ট নিজের ভেতর বিসদৃশ দৃশ্যমান হওয়ায়। আমরা সবাই নিজের ভেতর নিজের বিসদৃশ্য বাস্তবতাকে মানতে চাই না। কিন্তু এটাই সত্য। সমাজের কাছে একজন মানুষ খুবই একা, নগন্ন, তুচ্ছ। তুচ্ছ যা কিছু তার অনেক ধকল সইতেই হয়। এগুলোই সহজ সত্য।

এই যে তুমি কত সহজে বলে যাচ্ছ। এটা আমি কেনো পারি না।

পারবে, এখন থেকে পারবে, একবার পারলেই হয়। প্রথমবার যখন মৃত লাশের বুক চিরতে দিয়েছিল, পারিনি, একজনও না। মূর্ছাই গেলো কত জন। তারপর তারা সকলে এবং আমি ঠিকই আজ ডাক্তার। পেরেছি। শুরুটাই কঠিন।

সে তো মহৎ উদ্দেশ্যে রুকমী, একটা কিছুর স্বার্থে...

কিসের মহৎ উদ্দেশ্য, সবই চাকুরীর জন্য, পয়সার জন্য। সবই রুজীর জন্য ব্যবস্থা নির্মাণ। তোমার এই মেনে নেয়ার পেছনেও সিস্টেমের একটা বড় স্বার্থ আছে। স্বার্থ তো স্বার্থই, তোমার আমার স্বার্থ থাকতে পারে, সিস্টেমের পারেনা?

এগুলো কি সব ডঃ রুমকী বলছে, না তার সেমি সোস্যাল ভাই..

আমার ভাই আবার এর মধ্যে কোত্থেকে এল গো? ভাইয়া ভাইয়াই। ভাইয়া যা বলে ঠিকই বলে। চোখ মুছ। লজ্জা লাগছে না, বাসর রাতে বউয়ের সামনে কাঁদছ। ঘুমাও। ওসব তত্ত্ব কথা শোনার অনেক সময় পড়ে আছে।

তা ঠিক বলেছো, দেড় মাসের সাসপেন্ড সাসপেন্ড খেলায় খেলতে হবে। আমিও একজন খেলোয়াড়, হা হা।

তুমি ঘুমাবে?

ঘুমাবো কেনো? আজ আমার বাসর রাত না। এমনেতেই সেই রাতে তোমার স্বপ্ন ধূলিস্মাত করে দিলাম।

পুলিশ বিয়ে করেছি, ওসব নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকলে হবে...তুমি ও বুঝবে নাইট ডিউটি ডাক্তারদেরকেও কেমন দূরে দূরে রাখে।

প্রতিশোধ !...তবুও কত স্বপ্ন থাকে বাসর নিয়ে।

আজকাল থাকে না, ওসব ওল্ড হয়ে গেছে।

দূর সব কিছূ ওল্ড হয় নাকি। বিয়ের তাইলে কি দরকার। ওটাও ওল্ড কালচার। আজকে এ কালকে সে, সেটাই তো ভাল , বল?

মেনে নিতে পারলে ভালই তো।

ওহ্! তাই। তা তোমরা সব কিছু মেনে নিতেই পার। আমিও তো পারি। তাহলে ওটাও তো পারা যাবে। কি বল।

তুমি খুব আপসেট, ঠান্ডা মাথায় ঘুমাও। এক ঘুমে সূর্য উঠে যাবে। সকালে উঠে দেখবে বউয়ের গায়ের সাত সকালের আটপৌঢ়ে গন্ধে মন মাতোয়ারা হয়ে উঠবে।

এখন বুঝি হচ্ছে না।

তা হলে বাসর ঘরে ঢুকে আর এসব আবল তাবল বকতে না। বাসর ঘরটাকে বাসরই মেনে নিতে। গুটুর গুটুর প্রেমালাপ করতে।

ও এই তাহলে রাগের কারন। এস বাসরের সূচনা করি। শুরু করব কোথা থেকে, ঠোঁট...

হয়েছে। অনেক প্রেমের সময় পাবে। এখন আমি ডাক্তার বলছি, বউ না, তোমরা শরীর খুব খারাপ, ঘুমাও, আদর আমার পরে পেলেও চলবে।

আচ্ছা একটা... বাসর রাতে একটা অন্তত চুমু নাহলে ...

মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, ঠোঁট যে বুলিয়ে দেবো না, তা কি একবারও বলেছি গো ...

শাহেদ! এই সাত সকালে মনমরা হয়ে বসে আছ কেনো? একটা মধুর রাত তোমার উদাসীনতা কি একটুও কমাতে পারেনি? আমাকে দিয়ে চলবে না? বল। দেখো তো ভিজে চুলে কেমন লাগছে। সাক সকালে বউকে ভেজা চুলে দেখে ...দেখনি নাটক সিনেমায় কত খুনসুটি কথা কণ্ঠে চলে আসে স্বামীদের , আর তুমি... একটু হাস না। হাসতে ভুলে গেলে কেনো?

কেনো হাসব না। এমন সুন্দর বউ থাকলে হাসি কি মরতে পারে। আই ঠান্ডা লাগছে তো। চুলের পানি বরের গায়ে দিলে কি যেন সমস্যা হয়, শুনেছিলাম কোন এক চাচীর মুখে।

এই নাও আরেকটু বেশী করে দিলাম।

হাতটা সাথে সাথে টেনে এক প্যাচে নিজের কোলে ফেলে দিলো রুমকীকে... তারপর চারটি চোখ অনেকক্ষণ নিরুত্তর।

রুমকীই মুখ খুলল, চল, ভাইয়ার সাথে দেখা করে আসি। কাল বিকালে কথা হয়েছে। সম্ভবত আছেন এখনও। ফোন দেবো, যাবে।

হুম !যাওয়া যায়। চাকুরী চ্যুত মানুষ কি আর করব।

ভাইয়া কোথায় তুমি?

বান্দারবন শহরে, রুমার দিকে যাত্রা করছি।

ভাইয়া তুমি চলে গেলে কেনো? তোমার সাথে তো শাহেদের দেখাটাও হলো না।

হয় নি, হবে। আমি গেলেই দেখ কত আপদ বিপদ ঘটে। আমি অপয়ারে। এই দূরে আছি। এই তো ভাল। প্রকৃতি তাতেই মঙ্গল বয়ে আনে রে লক্ষ্মী বোন আমার।

তুমি ঐ বনে জঙ্গলে থেকে শেষ হয়ে গেছো একদম, ঐ সব বিশ্বাস সত্যিই কর নাকি, কবে থেকে ..

বিশ্বাস না , প্রভাব। প্রভাব সত্য রে, বিশ্বাস না ...ও তুই বুঝবি না, সে যাক ভুলেও কারও সামনে উচ্চারণ করবি না ঐ বিষয়ে, অন্তত জুয়েল বম আর আমার কথা তো নয়ই। মনে রাখিস। শাহেদ কোন দিন যেন না জানে। তোর আর তোদের সকলের উপকার করতে গিয়ে জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা শাহেদের করে দিলাম। মরে গেছে, না যাচ্ছে আসলে। কোষ একবার মরে যেতে শুরু করলে মহামারী শুরু করে দেয়।

কি ক্ষতি ভাইয়া!

ক্ষতিই! ওর ভেতরের একটা আত্মা কাল মরে গেছে। আমি জানি ওই মৃত্যুটা কত ক্ষতিকর, কত ভয়াবহ! তবে লক্ষ্মী একটা বউ হিসেবে তুই সেই মরা আত্মাটার শূণ্যতাটুকু ভরিয়ে রাখিস, না হলে ও সহ্য করতে পারবে না। বাই দ্যা ওয়ে কি করছে এখন।

এই তো পাশেই ছিল। বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। কথা বলবা।

থাক পড়ে বলব। হাতে তো দুজনারই বেশ সময় তোদের, পারলে বান্দরবান ঘুরে যা। দুজনেরই ভাল লাগবে। আসবি কিন্তু। খালি সময়টা বলে দিস। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখানে অনেকেই আমাকে মানে। দূর্বল পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষরা এমনই হয় বুঝলি। সামান্য ব্যতিক্রমেই এরা দেবতা খুঁজে বেড়ায়। গুরুত্বপূর্ণ কথাটাতো বলাই হলো না। জুয়েলের মামা শশুর মানে এমপি সাহেবকে মনে করে বৌভাতে দাওয়াত দিবি। ভুল যেন না হয়। উনি আমার বোন জামাই শুনে কাজটা করে দিতে আপত্তি করেন নি। হাজার হোক ওনার জন্যতো আর সমাজসেবা কম করিনি। একটা সময় করে সায়মার বাবাকে কথাটা মনে করিয়ে দিস। উনার সাথেও আমার কথা হয়েছে। এমপি কিন্তু আমার সম্পর্কে কোন কিছুই ভুলেন নি। ঐ তোদের সমাজটা ছেড়ে আসলে ভালই হয়েছে। ওসব সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারতাম না। না হতাম ডাক্তার , না নেতা, সেক্যুলার, না সোসালিস্ট, না প্রো অ্যাকটিভ, না বুর্জোয়া ধ্বজা ধারী কেউ, না কিছুই না। জগা খিচুড়ী হয়ে যেতাম। আর এই শুকনো মস্তিষ্কটা নিয়ে খেলত অনেকেই।

ইস্, তাই তো বলি, ভাইয়া কি করে পারে! অসম্ভব সুন্দর শাহেদ, অসম্ভব। এই আমাদের দেশ, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য যারা আমরা সকাল থেকে রাত অবধি ইট পাথরের মেকী সভ্যতায় নিত্য হারিয়ে যেতে যেতে নিজেই ইট পাথর বনে যাই আর খুঁজে ফিরি প্রাণ সে ইট পাথরে। অথচ ততদিন আমরা আমাদের প্রাণ কোষগুলো ঢেকে ফেলি নিত্য পথের যন্ত্রনায়।

কি ব্যাপার কবি হয়ে গেলে নাকি ।

না হয়ে কি উপায়। কিন্তু তোমার এই পুলিশ ব্যারাক থেকে না বেরোলে ঐ দূরে সবুজ পাহাড় , স্বচ্ছ সরোবরে ইট পাথরের আত্মাটাকে ধূয়ে নেবো কি করে। আচ্ছা আমরা তো হোটেলেও থাকতে পারতাম। আফটার অল তোমার এই আফসেট টা আবার ফিরে আসত না।

আমি আফসেট, কই? সব মেনে যে নেয় সে আবার আপসেট থাকে নাকি। মেনে নিতে না পারলেই তো আপসেট হতে হয়, ভুগতে হয় শংকায়। তোমার মত সুন্দরী বউয়ের জন্য ভাবনার সূতোয় কি ছেদ পড়ার যো আছে।

মানে, কি, কি বলতে চাও, আমার জন্য তোমার জীবনের সূতো আর ছিঁড়ছে না। তা ছিঁড়ে কোন বনে কার আঁচলে যাবে? যাও ..আমর মানা নেই।

ভাইয়া এখনও আসছে না কেনো। আজকে না আমাদের চিম্বুক পাহাড়ে নিয়ে যাবার কথা।

এই যে এসে গেছি আমার লক্ষী বোন। কেমন আছ শাহেদ ? মন টন ভাল তো। সব ভুলে কেবল পাহাড় দেখতে থাক। এ এক অন্য জগত। এখানে ব্যস্ততা নেই, কিন্তু প্রাণটাও খুব চুপচাপ। অদ্ভুত নিরবতা। পৃথিবী ক্লান্ত হলে তার হৃদয়গুলোকে মনে হয় পাহাড়ে পাঠিয়ে দেয়, বিশ্রাম নেয়, এনার্জি নিয়েই আবার ছুটে চলে ঐ দৌড় প্রতিযোগীতার শহরগুলোতে।

ভাইয়া, তোমার এত দেরী হলো কেনো?

গুড শাহেদ, এই তো তুমি বলতে শিখে ফেলেছো, কাল তো বলছিলে পারবে না। আমরা তো এক ব্যাচের পার্থক্যে কেবল এসএসসি পাস করেছি, তুমিটাই ভালো। অসুবিধা কি। একটা কথা বলি শাহেদ, রুমকীর কাছে তোমার যে হাসিখুশি চেহারার কথা শুনেছি সেটা এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। ওসব ভুলে যেতে পারছ না আসলে, তাই না। শোন, বৃষ্টির মাঝে রোদ

প্রত্যাশা করা কি বুদ্ধিদীপ্ত কাজ। রোদ হতেও পারে বৃষ্টিতে। সেটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বাড়তি প্রাপ্তি। ওটা প্রাপ্যতা নয়। এই যে দেখ সকালে রুমা বাজারে আটকে গেলাম এক আজব সমস্যায়। বম উপজাতীর দুটো ছেলেকে কাল থেকে আর্মিরা আটক করে রেখেছে। একটা ছেলেকে আবার আমি চিনি, ঐ যে আমার বন্ধু জুয়েলের ছোট কালের বন্ধু। থাকে রুমা থেকে একটু দূরেই। ছেলেদুটোর অপরাধ কি জানো। বন দস্যু। গাছ চুরি করছিল। সেগুন গাছ। ঐ বনটা সরকারী মালিকানাধীন। সেখানে তারা গাছ কাটছিল। তারই পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন, আসলে লিজ নেয়া বোধহয়, সে যাহোক, মালিক সেটা দেখতে পেয়ে লোকজন নিয়ে ধরে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে এসেছে। থানায় পাঠানো হবে। তার আগে প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় ওরা উত্তর দিলো, মালিক কাটতে পাঠিয়েছে। কোন মালিক? ঐ বনের মালিক।

এই না বললেন সরকারী বন।

আরে মজাটা তো সেখানেই। এক ফরেস্ট অফিসার নিজে ঐ দুটোকে পাঠিয়েছে বন থেকে গাছ কেটে নিতে। তার সাথে যোগাযোগ করা হলো। এক বিশেষ ঘটনার কারনে তার সাথে আমার আবার সখ্যতা ছিল। সকালে আগে বান্দরবানে এসে তার সাথে দেখা করলাম। কি বলল জানো? চট্রগ্রামের একজন এমপির নাম। সেই তার কাছে কয়েকটা সেগুন গাছ চেয়েছে। বাড়ীর দরজা টরজা বানাবে বোধহয়। বেচারা ঐ জুনিয়র ফরেস্ট অফিসার পড়েছে বেকায়দায়। উপরে লিখিত পারমিশন চাইল। পেলো না। সবার ঐ এক কথা, চুপচাপ কেটে পাঠিয়ে দাও। তারপর ঐ অবস্থা।

অবশ্য আমি তার কাছে তদবীরে যাবার আগেই শুনলাম ছেলে দুটো কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফরেস্ট অফিসারটি এমপির সাথে বহু কষ্টে যোগযোগ করতে পেরেছিল। তিনি ব্যবস্থা করেছেন। এই দেশে এই জিনিসটা খুব কাজের। কিছু কিছু অবস্থান থেকে কেবল টু শব্দ করলেই সব সমাধান হয়ে যায়।

তা যা বলেছো রেশাদ ভাইয়া। কিন্তু শক্তিটাকে এরা ভালো কাজে লাগায় না, সেটাই কষ্ট দেয়। কত আশা নিয়ে আমারা এই যে সরকারী সেবাকর্মে নিয়োজিত হলাম। তার এত সুন্দর পুরষ্কার । সাময়িক সাসপেন্ড অর্ডার ...না ভাইয়া! খুবই স্ট্রং একটা শক্তি। কোমর ভেঙে দিলে আমরা দাঁড়াবো কি করে।

কেনো জানো না দুর্নীতি নিজেই একটা বিশাল শক্তি। কিন্তু খুবই সেনসিটিভ এবং উত্তপ্ত ঐ জিনিস, সেই শক্তিকে কাজে লাগানো অত সোজা না। কিন্তু লাগাতে পারলে কিন্তু একটা নিছিদ্র ভবিষ্যত আছে। তৃতীয় বিশ্বে মানুষের নানাবিধ সমস্যা মিলিত হয়ে দুনীতীর পথ তৈরী করে দেয়। শুধু তাই না পথে বিছিয়ে দেয় লাল গালিচাও।

আপনি কি বলতে চাইছেন, উন্নত বিশ্বে দুর্নীতি নেই।

কেনো থাকবে না। তবে ঐ খনে দুর্নীতি আন্ডার গ্রাউন্ড দিয়ে কোন মতে মাঝে মাঝে চলে আর কি। কোন সুপথ নেই তার চলার। কারন নানাবিধ সমস্যার মিলিত ঘন মেঘ নেই সে আকাশে।

কিন্তু এই নানাবিধ সমস্যা হতে আমাদের মুক্ত হতে গেলেই তো অনেকের আতে ঘা লাগে। প্রথায় বাধা পড়ে। প্রথা নষ্টের ধুয়ো ওঠে দিকে দিকে।

ওসব সমস্যার সমাধান করাটা মূল উপায় নয়। একটা সময় মানুষ আগুনের চেয়ে বেশী ভয় কোন কিছুকেই পেত না। কিন্তু সেই ভয়ংকর আগুনকেই কাজে লাগিয়েছে মানুষ নিজের উন্নয়নে। দুর্নীতিকে সেভাবে কাজে লাগাতে হবে।

দূনীতির আবার কাজে লাগানোর কি আছে, ও ধ্বংস ছাড়া আর কি দিতে পারে। দুর্নীতি হরো ঘুন পোকার মত, ভাইয়া।

পারে। তৃতীয় বিশ্বে পারে। তবে সে ফিলোসফিতো আমি দেবো না। আমি তো কোন যুগান্তকারী অবতর নই।

তারমানে মানুষ দিয়ে হবে না। অবতর লাগবে।

তাও ঠিক না। তবে সেটা যদি বলে দেবো তাহলে আমি এই পাহাড়ে পালিয়ে থাকতে আসব কেনো? কিন্তু কাজে লাগাতে হবে। আগুনের মত দূর্নীতিটাকে সাবধানে ব্যবহার করে উন্নতির উপাদান তৈরী করতে হবে। দেখো শাহেদ, ঐ জুনিয়র ফরেস্ট অফিসার কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি, কারন কি? সে নিজেও কিছু সুবিধা পাবে এর বদৌলতে, এখন না হয় পরে, আর্থিক না হয়, মানসিক, অবস্থান গত সুবিধা ।

না ভাইয়া, পারে নি ভয়ে, পোষ্টিং এর ভয়ে, ঝামেলার ভয়ে।

তাহলে ধরে নেই সুবিধাভোগী হবে বলে সে প্রতিবাদ করেনি, আর তা না হলে সে প্রতিবাদ করতে পারে নি বলে সুবিধাভোগী হবে।

সেই একই ভাইয়া আল্টিমেটলি অবনতির নিম্নক্রম।

তাই তো হবে। কোন সেবা টেবার বালাই নেই তো। প্রতিটা কর্মই হয়ে উঠেছে ব্যবসা। পলিটিক্স নিজেই এক বিশাল ব্যবসা। সে অন্যদের ব্যবসা করতে মানা করবে সেটা মানায় না। সে উপদেশ আর আদেশ মিথ্যে বুলি হয়ে বিষবাষ্প ঝড়ায় সমাজে।

ঠিক বলেছো, ধর্ম ও তাই ব্যবসা এখানে, শিক্ষাও ব্যবসা, ব্যবসা নেই কোন কাজে?

এই যে শুনছো, তোমরা কি শুরু করলে, খেয়ে চল কোথায় নিয়ে যাবে রওয়ানা দেই..

তাহলে শাহেদ শেষে কি বুঝলে-দুর্নীতিকেই কাজে লাগাতে হবে সব সমস্যা সমাধানে।

না কোন দিনই না। আমি মানছি না। আপনার যুক্তি কিন্তু নেই। আপনি সেটা কিন্তু প্রমাণ না করে এড়িয়ে এখন জোর করে চাপাচ্ছেন। আমি মানতে রাজি না। যদিও এর চেয়ে বড় জিনিসই মেনে নিলাম। বলেন, বলেন সে কথা।

এই দেখো। আবার এ কথা সে কথা থেকে সেই শেষমেষ ঐ খানে। শোন একটু ইশারা দেই। ঐ যে ছেলেদুটো যখন বন থেকে কাঠ চুরি করে সেটা চট্টগ্রাম নিয়ে যেতো তখন তাদের পথিমধ্যে চেক পোষ্টে পোষ্টে নির্দিষ্ট অংকের টাকা গুনতে হতো। যাকে বলা হয় ঘুষ। কেউ না কেউ সেটা দিত। নিশ্চয় ফরেস্ট অফিসার সেটার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত। যেহেতু সে কাজটা গোপনে করতে চাইছিল। আর এখন যখন গাছগুলো পাঠানো হবে ঐ এমপির নাম করে তখন কোন বাধা বিপত্তি হবে না। গাছগুলোর গায়ে অদৃশ্য সিল লেগে গেছে। ওগুলো কি সুন্দর, বিনা বাধায় সব বাধা পাড়ি দিযে জায়গা মত পৌঁছে যাবে। এখন বিষয়টা একটি সংশ্লিষ্ট গন্ডিতে প্রকাশিত।

আমি রেডি, তোমাদের হলো।

এই তো, চলো।

দুটো রুম- গেষ্ট হাউজের ব্যবহার করছে শাহেদ। অফ টাইম কেউ আসে নি। ফাঁকা বলেই দুটো। ক্ষমতা থাকলে কে না ব্যবহার করে। আর এই তো স্বাভাবিক । শাহেদও তো এখন সেই চিরাচরিত দলের নব্য সদস্য।

দাঁড়াও ভাইয়া একটা ফোন এসেছে, ধরেই আসছি।

সৃজয়া, তুমি! কেমন আছ? আমি তো বান্দরবান। আউটিংএ এলাম। সাথে হানিমুনটাও... ভাইয়াও আছে আমাদের সাথে।

তাহলে থাক। পরে ফোন দেবো?

না বলো।

কিন্তু কথা দাও, তোমার ভাইয়াকে বলতে পারবে না। যা বলব তা শুধু তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে।

আচ্ছা বল। কথা দিচ্ছি।

আসলে তোমাকে খুব দরকার ছিল। তুমি তো ঢাকাতেই নেই। কবে আসবে।

চলে আসব। অনেকদিন হলো এসেছি। কক্সবাজার ছিলাম পাঁচ দিন। তারপর এই বান্দরবান। আছি আর তিন-চার দিন। চট্টগ্রামে থাকতে পারি। বল, ফোনে বলে দিলে হবে না। কি কাজ...কোন ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সৃজয়া ...তুমি কি কনসিভ ..

তোমাকে ছাড়া কারও উপর ভরসা করতে পারছি না। তুমি কাউকে বলতে পারবে না। প্লিজ।

আচ্ছা বল না।

হুম, তুমিই ঠিক, কনসিভ করেছি। কিন্তু আমি বাচ্চাটা অ্যাবরশন করাব। আজকেই করাব।

আবার! তোমার যে শরীরের অবস্থা দেখলাম। এ অবস্থায় তোমার কনসিভই করা ঠিক হয় নি। তারউপর নষ্ট করবে ...দ্যাট শুড নট বি রাইট ।

তুমি হেল্প না করলে, প্লিজ...লক্ষ্মী বোন আমার। ঐ পশুটার কোন সন্তান আমি পৃথিবীতে আসতে দেবো না। মরে গেলেও না। তুমি একটা ক্লিনিকে পার্টটাইম বসতে না আগে। ওখানে একটু বলে দাও না। আমি যাব!

দ্রুত চিন্তা করল। একবার ভাবল ভাইয়া বলে আটকায়। তাতে ভাইয়া যদি অশান্ত হয়ে ওঠে। কি করবে। ঐ ক্লিনিকে পাঠানোও ঠিক হবে না। ওখানে অ্যাবরশন না টাকা দিলে সবই করে দেবে, ডাক্তার ও লাগে না। কিন্তু তাতে অঘোরে জীবনটাও দিতে হতে পারে।

না সৃজয়া আপু ওখানে যেও না। ওরা মানুষ না। ওটা কসাই খানা। আমি অনেক আগেই ওটা ছেড়েছি। তুমি বরং সায়মার সাথে দেখা কর। আমি বলে দিচ্ছি। সায়ামকে চেন তো। আমার বান্ধবী । এখন আমার...

হ্যাঁ চিনি, তোমার ভাগ্নী তো...ওকে তুমি শুধু বলে দিও। যা বোঝানোর আমি বোঝাব। আচ্ছা তোমার ভাইয়া কেমন আছে। ওকি সত্যি সত্যি দাড়িটা রেখেই দিয়েছে। চুলগুলো নিশ্চয় সেই এখনও লম্বা লম্বা খানিকটা। ...

রুমকীর চোখে জল এসে গেলো। সৃজয়া আপু, খুব সাবধানে থেকো? আরেকবাার ভেবে দেখো। প্লিজ । কাজটা ঠিক হবে না।

তোমাকে বলে কি আমি ভুল করলাম?

সব ছেড়ে চলে আসতে পার না। কি দরকার তবে ..

পারলে কি আর থাকি বল। উফফ! ওসব বাদ দাও। আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। তাই তো এত ভালোর মধ্যে কোন সন্তান নিয়ে খারাপ থাকতে চাই না। সয়ামার নম্বরটা দাও।

সায়মাকেও সাথে সাথে ফোন করে রুকমী বলে দিল। তবে খেয়াল করে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে বলল বান্ধবীটাকে।

বাকী দুদিন বান্দরবান আর তার আনাচে কানাচে খুব ঘুরলো রেশাদের সাথে শাহেদ আর রুমকী। রুমা পর্যন্ত গেলো না। অতটা কঠিন রাস্তা রুমকীর প্রথম প্রথম সহ্য হবে না। সরকার কি আর ওদিকে তেমন পথঘাট বানাতে চেয়েছে কখনও। রুমা খালের উপর এক ব্রীজ হবার কথা। পিলার তৈরী হয়ে পড়ে আছে সেও কম করে ৫/৬ বছর। বাকী কাজের আর কোন খবরই নেই। আজব!

অবশ্য শৈলপ্রপাত, নীলগিড়ি, নীলাচল, মেঘলা এসব দেখেইতো মুগ্ধতায় নিমগ্ন হয়ে থাকল ডাঃ রুকমী। কি অপূর্ব বান্দরবানের বিশাল বৌদ্ধমন্দিরটি। অসাধারন নির্মান শৈলী। ঠিক যেমন দেখা যায় চীন জাপানের ছবিগুলোতে। সোনালী আভায় স্বর্ণ সৌধ যেন মন্দিরখানা। কষ্ট একটাই উপরে উঠার সিঁড়িটা বড় খাড়া। পা ধরে যায়। উপরে উঠে ক্লান্ত শাহেদকে মজা করার জন্য রেশাদ বলেই ফেলে, বুঝলে শাহেদ উপরে উাঠার সিঁড়ি এমন কষ্টদায়কই হয়। আরামে উপরে ওঠা যায়না, তাই না!

শাহেদ ও কম যায় না। হ্যাঁ, তা ঠিক। আরও বুঝলাম একবার উঠতে পারলে কিন্তু মজাটাও কম না।

রুকমী সাথে সাথে বলে ওঠে, নিচে নামার আনন্দটাও কিন্তু একটু পরে পাওয়া যাবে।

সুখ সুখ সবুজের মাঝে এই ভ্রমনের আনন্দ মাঝেও মনের মধ্যে একটা ব্যাপার সারাক্ষণই খোঁচাচ্ছিল রুমকীকে। সায়মা সৃজয়ার অ্যাবরশনের বিষয়টা সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও সায়ামা জানে না ও মেয়েটাই রেশাদ ভাইয়ের সৃজয়া। রুমকী সেটা গোপন রাখাই ভাল মনে করেছে। কিন্তু মন মানছে না।

বিদায় নেয়ার সময় রেশাদের কানে কানে কথাটা সে বলেই দিলো। শুনে দুমিনিট চুপ থাকার পর শোনা কথাটা না শোনার মত ভান করে শাহেদের সাথে কিছু শেষ অকারন ফিলোশপি কপচাতে এগিয়ে গেলো পথ ধরে।

রুমকীরা চলে যাবার পরে আর দেরী করে নি। অস্থির লাগছিল। রুমাতেই ফিরে গেলো রেশাদ। চান্দের গাড়ীতে ওঠেনি। পরিচিত একটা বম ছেলেকে পেয়ে তার সাথেই হাঁটা পথে রওয়ান দিয়েছে। ছেলেটা চট্টগ্রাম

ভার্সিটিতে পড়ে। তার সাথে কথা শুনে বুঝল পলিটিক্যাল ক্যাচালে হল ছেড়ে এই অসময়ে চলে আসতে হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই নাকি পরীক্ষা। সে অবশ্য সরকারী দলেরই কর্মী। কিন্তু ওখানে বিরোধী দলের একচ্ছত্র আধিপত্য এখনও খর্ব হয় নি। এবার হবে। ভয়টা তাই বেশীই বলে চলে এসেছে।

রেশাদ তাকে বলছিল, এই তোমাদের এই পাহাড়েই কত কত সমস্যা। এখনও কত কিছু থেকে তোমরা বঞ্চিত। পলিটিক্স তো এখানেই হবে। ওই খানে গিয়ে তুমি কি পলিটিক্স করবে? স্ব জাতির ভাগ্যাকাশে কি সূর্যের উদয় ঘটাবে বলতো দেখি?

ছেলেটা উত্তর দিয়েছিল, ঠিকই বলেছেন, পলিটিক্স তো এখানেই। মেইন স্ট্রিমে না পৌঁছালে আমদের মত সংখ্যা লঘুদের কথা কেউ শুনবে না। সে কারনেই তো ওখানে সিঁড়ি খুঁজছি।

আবার সিঁড়ি! নিজের বন্ধুবর জুয়েলের কথা মনে পড়ে। সিঁড়িতে উঠে উঠে হাঁপিয়ে গেছে। পেছনের নিচুতে আর নামতেই পারে না। চুপ করল বেশী আর বাড়ল না এ ব্যাপারে তার সাথে। শুধু শেষ একটা কথা বলল, ব্যবহার হয়ো না। যা ঘটবে তাকেই শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে শিখবে, দেখবে একদিন মিলন মেলা হবে সমতল আর পাহাড়ের শান্তি সুনিবিড়ে।

দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলো রেশাদ। দুপুরে একটা ক্লাশ নিল। মনটা সৃজয়ার চিন্তা মুক্ত রাখতেই হবে। তখনও সূর্য পাহাড়ের কোনা দিয়ে নেম পড়েনি। যদিও পাহাড়ি এলাকায় একটু আগেই সূর্য মুখ লুকায়। আজ যেনো থেমে থেমে যাচ্ছে। উচাটন রেশাদের মন ছেড়ে সূর্যও যেতে চাইছে না।

রেশাদ বসে আছে পাহাড়ের এক কোনায়। খুব উঁচু পাহাড় নয় এটা। প্রায়ই বিকেলে কিছু সময় এখানে ও বসে থাকে। ডান দিকে একটা ঢাল নেমে মিশে গেছে রুমা খালে। সেই ঢালের গোড়ায় অনেকগুলো বড় বড় অজানা গাছের সারি। খালে ও ওপারে ডানে একটা ঘন সেগুনের গাছে মোড়ানো পাহাড়।

বিকেলটা শেষ হতে থাকলেই এখানে পানির ঢেউ এর আওয়াজ শোনা যায়। সেখানে পাহাড়ের শত আনন্দের সুর যেমন বাজে তেমনি বাজে নানা দুঃখের সুর। কোথায় ইতিহাস হয়ে গেছে কোন অজানা ঘটনা, কে জানে, পৃথিবী হয়তো নিজেই ভুলে যায় এক সময়। আর মানুষ তো ক্ষণিকের। গাছে পাখি ডাকছে। একটা আওয়াজ চিনল। বউ কথা কও পাখি ওটা।

সূর্যটা সেগুনের গাছের ফাঁক দিয়ে করুন শেষচাহুনী দিতে দিতে শূণ্যে লুকিয়ে আঁধারকে সুযোগ করে দিলো চলে আসতে। অন্যান্য দিন সন্ধ্য ঘনিয়ে এলে উঠে পড়ে রেশাদ। আজ আর উঠলো না। ধীরে ধীরে নদীর পানি কালো রূপের আয়নাতে পরিণত হলো। আঁধার স্বচ্ছতাকে খেয়ে ফেললো খুব দ্রুত। খুব টায়ার্ড লাগছে। আকাশের মাঝে পূর্ণ একটা চাঁদ উঁকি দিতে শুরু

করলো। কালো জলে সেই চাঁদের স্পষ্ট ছায়ায় চোখ আটকে গেলো রেশাদের। ওই তো ওই তো তার প্রিয় সৃজয়ার মুখটা সে জলে হাসছে। কপালে চাঁদখানি তার হলূদ টিপ হয়ে ফুটে আছে। সৃজয়া ভর করেছে । আজ কিছুতেই আর নিরুত্তাপ রেশাদকে পাওয়া যাবে না। বড্ড ক্লান্ত শরীর, সেই সকালে কতটা পথ হাঁটা, তারপর মনের উপর অধঃ নিয়ন্ত্রন। চোখ ও মানছে না। তবুও কালো জলে হলুদ টিপ তাকে উদাস করেছে ভীষণ। সেই কবে কতদিন আগে তুরাগের পারে বাধের ধারে, সুনশান সন্ধ্যায় এমনই জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে , পাশে খুব কাছে দেহের মিষ্টি গন্ধ পুরোটা নিয়ে নেওয়ার মত কাছে সৃজয়া তখন। নদীর কালো দর্পনে সৃজয়ার মিষ্টি মুখচ্ছবি, কালো জলে চাঁদ তখন হলুদ টিপ, অপূর্ব। সব হারিয়ে গেছে। রেশাদের মনে পড়ে মাথায় একটা ছন্দ ঘুরছিল। কাগজ ছিল না। কলম একটা পাওয়া গিয়েছিল সৃজয়ার পার্সে। সৃজয়া রেশাদের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। শাড়ির আঁচল সরে গিয়েছিল বাতাসে। খোলা উদরের সবটুকুতে কলমের ছোঁয়ার লেখা হয়েছিল ছন্দগুলো...

হাত ধরেছে হাতটি তোমার
মন ধরেছে মন,
নদীর জলে চাঁদ হয়েছে
হলুদ টিপ যখন। ...

কখন ঘুমিয়ে পড়ে রেশাদ সেই খোলা আকাশের তলে পাহাড়ী নদীর ধারে। সৃজয়ার কল্প হাতটি তাকে ধরে রাখে সারারাত।

বেশ কয়েকটা মাস পরে সায়ান আবার আইইএলটিএস পরীক্ষাটা দিয়েই দিল। এবার আর কোন ঝুট ঝামেলা হয়নি। শাহেদ মামার পুলিশের গাড়ীতে চড়ে দিব্যি আরামে পরীক্ষা দিতে গেছে। সেই গাড়ীতে চড়েই এম্বেসীও ফেস করা হয়ে গেছে। শুধু তাই না দ্রুতই ইংল্যান্ডে ভর্তি প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। ভিসা নিয়ে বসে আছে। খুব শীঘ্রই এইসব সমস্যা শঙ্কুল মায়া থেকে পরিত্রান নেবে সায়ান। উড়াল দেবে ঐ উঁচু আকাশের মেঘের কোল ঘেষে ।

বিদেশ পলায়ন সফলতার জন্য শিমকী তার অপূর্ব সুন্দর সুর দীঘল কালো চোখের কোনে ফোঁটা ফোঁটা জল নিয়ে যেদিন শেষবারের মত শুভেচ্ছা জানালো সেদিন সায়ানের সেই অধর স্পর্শের আশাটা আর আশা হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকেনি। চারটা টিনএজ ঠোঁট বুঝেছিল ভালোবাসা কত গভীর। তারপর কান্নাটা বেড়ে যেত পারত। সেটা ঠেকাতে সায়ান ধ্যানা পার্কের সেই নির্ভৃত থেকে উঠতে উঠতে সেই ভর দুপুরের নির্জনতায় ধ্যানার লালসালুর দিকে তাকিয়ে বলল, ইংল্যান্ডে নিশ্চই এভাবে মিথ্যে প্রবঞ্চনার লালসালু ওড়ে না, তাই না শিমকী?

শিমকী কিছু বলেনি। সায়ানের হাতটা খুব শক্ত করে ধরে পার্কের গেটের দিকে হাঁটছিল। মুখটা সায়ানের দিকে উচিঁয়ে ফিসফিস করে বলেই ফেলল, তোমাকে খুব বেশী ভালবাসি, খুব বেশী।

সায়ান হাত দিয়ে সুন্দর চোখের জলীয় কলংকধারা মুছে দিল।

সেদিন রাতেই ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো সায়ান।

ঘরে অন্ধকার দেখে বেবী এসেছিল। রেশাদ বলল, রাতে খাব না। দরজাটা চেপে দিয়ে যাও।

রেশাদ ভাইয়া আপনার শরীর খরাপ লাগছে?

না , একটু টায়ার্ড আর কি? এমনেতে ঠিক আছি। কেউ এলে ডেক , না হলে থাক, রাতে খাব না। তোমার ভাইয়ার সাথে কথা হয়েছিল। ওরা আসতে পারে। তবে বান্দরবানেই থাকবে মনে হয়। তোমাদের ওখানে গিয়ে একটু কষ্ট করে দেখা করে আসতে হবে।

সত্যি। যাই মাকে বলে আসি।

দরজাটা চেপে দিতে গিয়ে আবার ফিরে আসে বেবী।

ভাইয়া একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

বল।

গত মাস দুয়েক ধরে দেখছি অনেকদিন রাতেই আপনি ঘরে থাকেন না। বাইরে মশা সাপ টাপ থাকে, আপনি শহুরে ছেলে কোন না কোন বিপদে পড়েন।

এখনও শহুরে আছি? তোমাদের হতে পারিনি? আচ্ছা ঠিক আছে। মাঝে মাঝে কই। ওই তো নদীর ধারে ঐ উঁচু টিলাটায় ক'দিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরপর জানলে তো। ঘরে না পেলে খুঁজে নিয়ে এস।

বেবীকে তো চলে যেত বলল। খিদে পেতে শুরু করেছে। জ্বরও আসছে মনে হয়। কেমন যেন একটা ঘোর এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পুরো মাথাটা।...

কে, কে ওখানে। হাতের টর্চটা পাশেই তো থাকে। দুতিনবার এ দিকে ওদিকে হাত দিতেই সেটা হাতে ঠেকল। তারপর আবার বলে উঠল, কে কে..

চুপ, আস্তে, কেউ শুনে ফেললে নির্জনতায় এই অপূর্ব বিরহ বিচ্ছেদ, এই মুহূর্ত টুকু মাটি হয়ে যাবে তো...

টর্চটা আগুন্তকের চেরায় ফেলতেই চমকে লাফ দিয়ে চকিতে বিছানা থেকে উটে পড়ল রেশাদ।

সৃজয়া, তুমি এই এখানে ...কিভাবে।

যেভাবে তুমি। আর কত? চলেই এলাম। রাখবে না পাশে পাশে?

রেশাদ সৃজয়ার মুখের উপর আলতো করে আঙ্গুল বুলিয়ে দেখে সত্যি।রক্ত মাংসের মানুষ কিনা

এ কি অবস্থা করে রেখেছো নিজের। কি চেহারা হয়েছে তোমার সৃজয়া। এত রুক্ষ হয়ে গেছো। গালের প্রতিটা হাড় স্পষ্ট চেয়ে আছে। কি নিটল কপোলের আজ কি করুন অবস্থা।

কেনো তুমি না হলিউডের নায়িকাদের প্রশংসা করতে। হাড়গিলে সব নায়িকারা বিশ্ব জয় করে চলল। আর আজ আমি হলেই দোষ ...

আচ্ছা আর লাগবে না। সোফিয়া লরেন থেকে আমার, সেই আমার লক্ষী সৃজয়াটা হয়ে যাও আবার।

হব; সে জন্যেই তো সব ছেড়ে, মুক্ত হয়ে চলে এসেছি। রুমকীটা যে বর্নণটা দিলো এই তোমার জগতের। লোভ হলো। দেখো স্বার্থপরের মত সামলাতে পারলাম না, চলেই এলাম। তুমি না একদিন স্বপ্ন দেখতে , আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে, আমার হাত ধরে বসে থাকবে একটা সবুজ পাহাড়ের উপর। আকাশে চাঁদ জ্যেৎস্না হবে সেদিন। আবার কখনও সাগরের পারে ঠান্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে শুয়ে থাকবে রেখে মাথাটা আমার কোলে। তোমার সেই কবিতাটা কিন্তু আমার আজও মুখস্ত। ...

শূণ্য থেকে শুরু আবার শূণ্যে ফেরার আগে
সবুজ পাহাড়-নীলসাগরে তোমার সাথে সাথে,

কাটবে সময় যে কটা দিন যেটুকু ক্ষণ ওগো
স্বপচূড়ায় ভালবাসায় জীবন জড়িয়ে নেবো।

স্বপ্ন ঘেরা মনটাতে গো দুঃখ হবে যে মলিণ
আশেপাশের কাছে দূরের নষ্ট স্মৃতি বিলীন;

চটুল কোন গহীন রাতের নিঝুম অমানিশায়
সুরের সাথে সুরের মিলন মোদের ভালবাসায়,
.....

মনে পড়ে রেশাদ, কবিতায় কথা ছিল, পাহাড়ের এই অবারিত সবুজে, সাগরের নীলে, সুখে দুখে দুজনা থাকব মিলেমিশে। অথচ দেখ একা, একাই তুমি থাকছ রেশাদ। ভীষন অন্যায়। আমাকে এসবর অংশীদার করবে না?

কেনো নয়। আমি তো আজীবন তাই চেয়েছি। কেবল তাই...এস এখনও সময় আছে, এস এস আমার দুহাত প্রসারিত করেছি, এস সে হাতের সীমানায়।

বেশ জ্বর হয়েছিল রেশাদের সেই রাত থেকে। ম্যালেরিয়া ছিল। জুয়েল বম এসেছিল বলে সেই কঠিন ম্যালেরিয়াটার একটা একটা দফা রফা হয়েছিল। বান্দরবান সদরে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সপ্তাহ দুয়েকের জন্য। জুয়েলে শত চেষ্টাও ঢাকা মুখো করতে পারল না রেশাদকে।

ঠিক যে রাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা ভয়াবহ হলো রেশাদের সেদিন তুমুল ঝগড়া হলো সৃজয়ার সাথে তার স্বামীর। অ্যাবরশনের কথাটা জেনে গিয়েছিলো তার গোয়ার স্বামীটা। মারধোর চরমে পৌঁছে গেলো। মেয়েটার শরীর এমনেতেই কুলাচ্ছিল না এত ধকল। আধা ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতেই পড়ে ছিল। কেউ এলো না কাছে। কেউ না। মা বাবা এসেও না আসার মতই। তাদের কাছে সর্বদা দোষ ছিল তাদের মেয়েরই। এবারও তাই। উল্টো বকে ঝমে গেলো। বললো, ওমন ফেরেস্তার মত জামাই না হয়ে অন্য কেউ হলে কেটে কুটি কুটি করে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতো।

পরদিন সকালে ক্রোধ চরমে থাকতে থাকতে সৃজয়া ডিভোর্স পেপারে সই করেই পাঠিয়ে দিলো কাগজটা। রেশাদের এক পুরোনো উকিল বন্ধু সৃজয়ার এই বিষয়ে বিনা ফিতেই সহায়তা করে বলেই সৃজয়ার জন্য কাজটি সহজ হয়। আর ফিরবেই না। রুমকীর কাছ থেকে বান্দরবানের রেশাদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিল। রেশাদের যে পরিচিত মানুষটি কাছে রুমকী ফোন করে খবর দেয় তার ঠিকানাও নিয়েছিল। রুকমী তো সেরকমই চেয়েছিল। পারলে সে তো নিজেই নিয়ে যায়। রেশাদকে জানিয়ে দিত চাইল। সৃজয়াই রাজি হলো না কিছুতেই। ওটা সারিপ্রাইজ হবে রেশাদের জন্য।

কিন্তু আপু, তুমি একা এই শরীরে যেতে পারবে। টাকা পয়সা আছে কাছে?

সমস্য নেই। শাহেদ কি একটু বলে দেবে বান্দরবানে অফিসের কাউকে আমাকে একটু রুমা পৌছে দিতে?

শাহেদ চাকুরী করছে ঠিকই, কেনো যেন ওই পরিবেশ আর নিজের আপন মনে হয় না। প্রয়োজনের বাইরে কাউকে ঐ পরিমন্ডলের সে কোন কথাই বলতে চায় না। নিরুত্তাপ ভাবে চলছে তার এত আশার চাকুরীটি আজ।

শাহেদ বলল, ঠিক আছে। বান্দারবানে থানায় গিয়ে আমাকে ফোন দিয়েন। আমি বলে রাখব। ওরা কিছু একটা আশা করি করবে।

কোন ফোনই দেয়নি সৃজয়া। রুমকী চেষ্টা করেছে বারবার। বারবারই বন্ধ। ভাইয়ার জ্বরের খবরটাও দিয়েছিল বেবী ফোন করে। রুমকী চাচ্ছিল আরেকবার যাওয়া যায় কি না? কি করবে বুঝতে পারছিল না। উপায় নেই। শাহেদও ব্যস্ত। মনে মনে এবার বাস্তবতার অমোঘ প্রেষণ মেনে নেয়ার পালা তখন তুঙ্গে। সে সবকিছু মেনে নিতে চাচ্ছে। সাসপেন্ডের পরে সবার দৃষ্টিতে ছোট ছোট হয়ে যাবে ভেবেছিল, অথচ হয়েছে উল্টোটাই। সবাই তাকে এখন খুব পছন্দ করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা শাহেদের সহ্য হচ্ছেই না।

সৃজয়ার জন্য টেনশন বাড়ছিল রুমকীর। বাধ্য হয়ে সৃজয়ার বাবার বাড়ীতে খোঁজ নিতে হলো। ওনারা আজকাল আর তেমন কথা বলতে চান না। তবুও বাধ্য হয়ে যেতেই হলো ও বাসায়। ওখানে গিয়েই তবে জানতে পারল তার প্রিয় আপুটা হাসপাতালে।

নিথর একটা মাংসের দলা যেন পড়ে আছে । পা একটা ভাঙা। প্যালেস্টার করে ঝুলিয়ে রেখেছে। চেহারায় লালচে কালো থেতলে যাওয়া চিহ্ন। সুন্দর মুখশ্রীটাতে অংখ্য কলংক দাগ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর উপর প্রচন্ড মারধোর হয়েছে।

রুকমী, পশুটা আমাকে ঠিকই খুঁজে বের করল। আমি পৌছানোর আগেই ওরা পৌঁছেছিল।

চোখ বাধা মানার মতো কোন জোর তার অবশিষ্ট নেই। দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল রুগ্ন শুকনো কপোল বেয়ে।

সৃজয়া কান্না জড়ানো কণ্ঠেই বলে উঠল, এই আক্রোশটাতে সে শান্তি পেয়েছে। আমার মৃত্যুপথযাত্রী বানিয়ে জয়ের স্বাদ নিচ্ছে। ডিভোর্স লেটারটা তাই সহজেই স্বাক্ষর করে দিয়েছে। সত্যি মুক্ত, আমি এখন সত্যি মুক্ত। রেশাদকে একটু খবর দেবে...অনেকদিন হাঁটতে পারব না। পারলে বলতাম না, দেখতাম নিজে গিয়েই কত অভিমান ওর। এখনতো একটু কষ্ট করে ওকেই আসতে হবে। ...

রুকমী প্রথম প্রথম পারে নি রেশাদকে সৃজয়ার এই করুন রুগ্ন কাব্য গাঁথা বলতে। অন্তত ম্যালেরিয়া থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। তারপর বলেছিল একদিন। না বলে আর কি উপায়। সৃজয়ার বাঁচার আশা ছিল না। সরকারী হাসপাতাল থেকে রুমকী নিজের তত্বাবধানে নিয়ে এসেছিল তাকে। নুতন যে ক্লিনিকটাতে কাজ করে রুকমী সেখানেই। তার ইচ্ছে, যদি শেষ একটা চেষ্টায়, আন্তরিকতায় তার প্রিয় আপুটিকে সুস্থ করা যায়।

খবরটা পাওয়ার পর একটুও দেরী করে নি। ঠিক তেমনি যেদিন এই সমাজ ছেড়ে পালাতে একটুও দেরী করেনি। আজ সৃজয়ার জন্য চলে এল ঢাকায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

রুমকী সৃজয়ার মা বাবাকে খুব আসতে মানা করে দিয়েছিল। সৃজয়া তাই চায়। আরও বলেছিল আপনাদের কোন রকম খরচ করতেও মানা করেছে আপু। উনি বলেছেন, শুধু আসবেন দেখবেন, মৃত্যু কামনা করে চলে যাবেন। সৃজয়া তার মার সাথে একদম কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।

রুমকী রেশাদ আর সৃজয়ার নির্জনতার মাঝে কোন বাধা সৃষ্টি করতে চায়নি। এতো বহুকালের পাওনা। কেনো অকারণ সমস্যা ঘটানো সেখানে। নিজের রুমটাতে গিয়ে বসল চুপচাপ। শাহেদের ভবিষ্যত নিযে ভাবতে বসল, একটু আগে ফোন দিয়েছিল, চাকুরীটা ও আর করছে না। আর সাসপেন্ড হতে চায়না। সবাই আসলে সমাজে মানতে আসে না। কেউ কেউ পালাতেও আসে। আজ অনেক খুশি লাগছে রুমকীর। অনেক গুলো মুক্তি যেন এক সাথে তার চারপাশে। সে জানে শাহেদ আজ থেকে আবার সেই মনখুলে হাসবে যে হাসি তার ভাল লেগেছিল গোপনে অনেক বছর আগেই।

...রেশাদ, তোমার হাতটা একটু ছোঁয়াও না মাথায়। মহাপুরষ যে হয়েছো বুঝতে পারছি, মানছি। মরে গেলে আর তো পাবে না। আমার কাছে মহাপুরষগিরি ফলিও না। আমি জানি আমার হাত ধরার জন্য বহুকাল তোমার মনে জোয়ার ভাটার ঢেউ বয়ে যেত। মনে পড়ে প্রথম যেদিন আমার হাতটা ধরলে, তুমি ইন্টার এর শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে এসেছো...

চুপ কর, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এ কষ্ট নাগো, শেষ শান্তি। ঐ কবিতাটা একটু শোনাবে।

ঐ যে নদীর ধারে আমার এই যে এই এখানে পেটের উপর লিখেছিলে। তারপর বাসায় গিয়ে তোমাকে ফোনে বললাম, তুমি কাগজে টুকে নিলে..

হাত ধরেছে হাতটি তোমার
মন ধরেছে মন,
নদীর জলে চাঁদ হয়েছে
হলুদ টিপ যখন।

কালো নদীর আয়না জলে
মিষ্টি তোমার মুখ,
তোমার বুকের রেশমী খাতায়
কবিতা লেখায় সুখ।

কালো জলে হলুদ টিপে
স্বপ্ন প্রদীপ জ্বলে,
মনটি ধরে রাখবে যে মন
অযুত নিযুত কালে।

চোখের কোনে জল এলে গো
অধর সে জল ছুঁয়ে,
চাঁদের আলোয় চুমুর বন্যা
কষ্ট দেবে গো ধুয়ে...

দুচোখ বেয়ে পানি নেমে আসে সৃজয়ার...আর বাকী লাইনগুলো বলা হয় না।

দেখ রেশাদ, ঐ যে জানালায় চাঁদটা আজও টিপ হয়ে এসেছে। কপালে একটা চুমু দেবে?

রেশাদ আরও শক্ত করে ধরে সৃজয়ার হাত দুটো। কপালে এঁকে দেয় অধরের পরশে অদৃশ্য টিপ। চাঁদটা এবার সত্যি হেসে ওঠে।

সৃজয়া তার মাথাটা রেশাদের কোলে রাখে। খুব কষ্ট হয় এইটুকু সরে আসতে। রেশাদ বোঝে। মোচড় দেয় মনটাতে মুহূর্তে। কেঁপে ওঠে মনের গহীনে তার সুপ্ত কষ্টের আগ্নেয়গিরিটা। হাতটা বুলিয়ে দেয় সৃজয়ার কপালে।

একটা কথা দেবে রেশাদ?

কেনো দেবো না। কিছুই তো দিলাম না বিরহ ছাড়া। বলো কি কথা? আমি তুচ্ছ, নগন্য। সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব।

না দিতে হবে, দিতে হবেই, খুব কঠিন না, তুমি পারবে। রাখবে কিন্তু।

গলাটা খুব ধীর হয়ে আসছে সৃজয়ার।

তুমি ফিরে আসছো নির্বাসন ছেড়ে। এই..এই.. কথাটা রাখতে হবে।

হাতদুটো ধরে খুব কষ্টে কথাটা বলে সৃজয়া।

নির্বাসন কে বলল, ওটা তো মুক্তি। আমি খুব ভাল আছি।

না, তোমার ভাল আমার সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বেঁচে থাকলে তোমাকে আসতে হবে না। তবে আমি মরে গেলে কিন্তু তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। আসতেই হবে।

সৃজয়ার হাতদুটো মুঠোয় ধরে রেশাদ কথাটা দিয়েই ফেলল। ...

তোমার ওখানে বোধহয় এখন রাত পৌণে বারোটা, তাই না? মোবাইলে কল দেবে? খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

কথাক'টা ফেসবুক চ্যাটিং এ লিখল শিমকী।

দেরী হলো না, ফোন এল সায়ানের সাথে সাথেই।

খুব জ্বালাচ্ছি তোমাকে, সকালে তোমার পার্টটাইম জব, তারপর ক্লাশ, আবার জব। এত কষ্ট শেষে একান্ত বিশ্রামে যখন তখন এই আমার জ্বালাতন।

দূর! আমার মনটাই তো এখানে সবসময় ফুরফুরে থাকে, কষ্ট বোঝারই সময় নেই। যে টুকু কষ্ট তা তোমার অভাববোধ। তাও এই যে নেটে রোজ চেহারা দেখছি, কথা বলছি। এই গ্লোবাল ভিলেজে দূরত্ব বলে কিছু নেই। তার উপর এখানে রাস্তায় যান জট নেই, ধুলোর কাতুকুতু নেই, অহেতুক ভয় নেই, আর কি চাই বল।

তাহলে সারাজীবন থেকে যাও।

খারাপ হয় না।

হ্যাঁ! তাই থাক। তোমার ওখানে জ্যেৎস্না দেখা যায়?

কেনো ওটা কেবল তোমাদের জন্যই প্রকৃতির উপহার নাকি?

তাহলে আকাশে তাকিয়ে দেখ। কি সুন্দর। ওহ মিলবে না তো, ওটাতো অন্য আকাশ, সমস্যাহীন বাতাস ছুঁয়ে থাকা আকাশ! এখানের সাথে একত্রে কি আর চাঁদ ওঠে ওখানে!

তা ঠিক। এটাও প্রকৃতিরই নিয়ম।

তা প্রকৃতি তোমার আমার জন্য কি নিয়ম তৈরী করে রেখেছে, সে অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করে কি জানাতে পারবে?

আবার অ্যাসাইনমেন্ট...!

ভয় পেলে? শোন খুব ভালএকটা খবর আছে। ভাইয়া এখন আমাদের সাথেই থাকেন। নির্বাসন থেকে অবসর নিয়েছেন।

তোমার ভাইয়া! মেনে নিয়েছেন? ফিরলেন তাহলে। দেখেছো শেষমেষ এই হয়..এসবই সাধারন...

না, ঠিক নিজের প্রয়োজনে ভাইয়া ফেরেনি। সৃজয়া আপু মারা গেছেন। আপুর শেষ ইচ্ছেটার সম্মানে ফিরেছেন। আপুর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়াই হয়তো ভাইয়ার ফিরে আসার কারন।

মানে, আপুটা শেষ পর্যন্ত আর বাঁচলই না। খুবই কষ্টদায়ক। কি সুন্দর আপুটা।

তুমি ও তাই করো , আমি মরে গেলেই দেশে ফিরে এসো। তার আগে কিন্তু এস না, এ দেশে অনেক সমস্যা, অনেক। সমস্যা ছাড়া আমরা বাঁচিনা। সমস্যাই এখানে স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। রাখছি। ঘুমাও...

***সমাপ্ত ***

লেখকের পুরো নাম মামুন মঞ্জুরুল আজিজ। জন্ম সুন্দরবনের ঘন সবুজের কোল ঘেঁষা সাতক্ষীরা জেলার শ্রীধরকাটী গ্রামে, দিনটি ছিল ১৫ই মে। কবিতা লেখা দিয়ে লেখার জগতে হাতেখড়ি হলেও ধীরে ধীরে ছোট গল্প লেখার লুকানো প্রবল ইচ্ছেটা মনের ভেতর হতে আলোয় উদিত হতে থাকে। ২০০২ সালে ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই.ইউ.টি) হতে তড়িৎ কৌশলে স্নাতক এবং ২০০৫ সালে বুয়েট হতে এডভান্সড ইঞ্জিনিয়ারীং ম্যানেজমেন্টে মাষ্টার্স সম্পন্ন করার পূর্বেকার ব্যস্ততায় তার লেখালেখি অবসর সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে লেখালেখি হয়ে ওঠে তার মনের অন্যতম খোরাক। সেই সুবাদে অনেক কবিতা, গল্প লেখা হয়ে যায়। যার অনেকখানিই রয়েছে অপ্রকাশিত। বিগত বছরগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের দুইটি কবিতা গ্রন্থ ও দুইটি ছোটগল্প সংকলন।

লেখকের অনেকদিনের ইচ্ছে অন্তত একটা মন উজাড় করা উপন্যাস রচনার। বিসিএস টেলিযোগাযোগ ক্যাডারের অধীনে বিটিসিএল (সাবেক বিটিটিবি) এর একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে বেশ কর্ম ব্যস্ততায় সেই মন উজাড় করা উপন্যাসটি এখনও শেষ করতে না পারলেও শেষ হয়েছে এই উপন্যাসটি যেখানে স্পষ্ট হয়েছে মামুন ম. আজিজের নিজস্ব অনেক উপলব্ধি।

প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ ঃ

পথিকের পথে পথে স্বপ্ন (২০০৬)
ধুলো তো উড়বেই (২০০৭)

প্রকাশিত গল্প সংকলন ঃ

ঋতানৃত (২০০৭)
তথাপি (২০০৯)

ISBN 984-70189-0028-8